ভারতী।

দুঃসময়।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
  সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
  যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
  দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
  তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
  এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

এ নহে মুখর বন-মর্ম্মর গুঞ্জিত,
  এ যে অজাগর গরজি সাগর ফুলিছে;
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
  ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে;
কোথারে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
  কোথারে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা!
  তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
  এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্ব্বরী,

বিশ্ব-জগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি
  স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে,
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
  দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা,
  ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
  এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

ঊর্দ্ধ আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি
  ইঙ্গিত করি' তোমাপানে আছে চাহিয়া,
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
  শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া,
বহু দূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
  এস এস সুরে করুণ মিনতি-মাখা,
  ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
  এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরোনা পাখা!

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ মোহবন্ধন,
  ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা,
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে' ক্রন্দন,
  ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা!
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
  উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা,
  ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
  এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা!

দুরাশা।

দার্জ্জিলিঙে গিয়া দেখিলাম মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট্ এবং আপাদমস্তক ম্যাকিণ্টশ্ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্ব্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয়-পর্ব্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে ছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর ত ভাল লাগে না, শব্দস্পর্শরূপময়ী বিচিত্রা ধরণী-মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদন-গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসঙ্কুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে—অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ,—কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের একমাত্র রোদনের মত আমার কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম গৈরিক বসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণকপিশ জটাভার চূড়া আকারে আবদ্ধ, পথপ্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে

তাহা সদ্যশোকের বিলাপ নহে, বহুদিন-সঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জনতার ভারে ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম—এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মত আরম্ভ হইল, পর্ব্বতশৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখন চর্ম্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিন্‌কালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে তুমি, তোমার কি হইয়াছে?"

প্রথমে উত্তর দিল না—মেঘের মধ্য হইতে সজল দীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম আমাকে ভয় করিও না আমি ভদ্রলোক।

শুনিয়া সে হাসিয়া খাস্ হিন্দুস্থানীতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয় ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জা সরমও নাই। বাবুজি, এক সময় আমি যে জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্ব সংসারে আমার পর্দ্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চাল চলন সমস্তই সাহেবী, কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন? ভাবিলাম এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যতনাসা সাহেবিয়ানার রেল-গাড়ির মত সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি! অব[illegible]হল জয় লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোন প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণক

পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন্ কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব গোলাম কাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কি দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না,—কিন্তু ভাবিলাম রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ কর, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্ব্বে কস্মিনকালে দেখি নাই, তাহার উপর এম্‌নি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্ট কণ্ঠে দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে!"

দেখিলাম রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিনবন্ধুর শিলাখণ্ডতলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী নুর উন্নীসা বা মেহের্ উন্নীসা বা নুর্ উল্ মুল্‌ক্ আমাকে দার্জ্জিলিঙে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্ত্তী অনতিউচ্চ, পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন। হোটেল্ হইতে ম্যাকিন্টশ্ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপ-কাহিনী সহসা সত্তসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মত শুনিতে হয়—পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জ্জন গিরিকন্দরের নির্ঝর-প্রপাতধ্বনি এবং কালিদাসরচিত মেঘদূত কুমারসম্ভবের বিচিত্র সঙ্গীত মর্ম্মর জাগ্রত হইয়া উঠিতে থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, বুট্ এবং ম্যাকিণ্টশ্ পরিয়া ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে কর্দ্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুন্ন-ভাবে অনুভব করিতে পারে, এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সেদিন ঘনঘোর বাষ্পে দশদিক্ আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোন বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি, এক নববিকশিত বাঙ্গালী সাহেব, দুই জনে দুই খানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুই খণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম,—এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারও দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল্ কে করিল?"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন "কে সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এত বড় প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে?"

আমি কোন রূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম—কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা ত কীট মাত্র!"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না—কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান্ এবং

বেহারাদের সংসর্গে যেটুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোন স্থানের কোন নবাব পুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফর্‌মায়েস্ করেন ত বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম—"বিলক্ষণ! ফরমায়েস কিসের! যদি অনুগ্রহ করেন ত শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে!"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এম্‌নি ভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিয়াছিলাম—বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবি সাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড-খণ্ড ভাবে বর্ব্বরের মত সোজা সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা আমার কোন কালে জানা ছিল না; বিবিসাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাট্‌বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল—সেই কুলগর্ব্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল—পিতা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহি

লোকের সহিত সরকার বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনো শুনি নাই—শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা—এ যে দিনের ভাষা সে দিন আর নাই—আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব্ব নিরলঙ্কার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষা মাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজ-রচিত আধুনিক শৈল-নগরী দার্জ্জিলিঙ্গের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেত-প্রস্তর রচিত বড় বড় অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্ব-পৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ-ঝালর খচিত হাওদা, পুর-বাসীগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেসমের মস্‌-লিনের প্রচুর-প্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারী, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ,—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমা-দের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশর লাল।"

রমণী এই কেশর লাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সঙ্গীত যেন একেবারে এক মুহূর্ত্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশর লাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম কেশর লাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যোড়করে উদ্ধমুখে নবোদিত সূর্য্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্ত-বস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজন গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

"আমি মুসলমান বালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্ম্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্ম্মসঙ্গত উপাসনাবিধিও জানিতাম না। তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এবং অন্তঃপুরের প্রমোদ-ভবনেও ধর্ম্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধ করি স্বাভাবিক ধর্ম্মপিপাসা দিয়াছিলেন অথবা আর কোন নিগূঢ় কারণ ছিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণা-লোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জ্জন শ্বেত সোপানতটে কেশর-লালের পূজার্চ্চনাদৃশ্যে আমার সদ্য সুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্য্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণ-সার সুন্দর তনু দেহখানি ধূম্রলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমান দুহি-তার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত—দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম্ম পার্ব্বণ উপলক্ষ্যে

এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া বলিতাম, তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না? সে জিভ কাটিয়া বলিত কেশরলাল ঠাকুর কাহারও অন্ন গ্রহণ বা দানপ্রতিগ্রহ করেন না।

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনরূপ ভক্তি-চিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ একজন একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন—আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্য-সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেব দেবীর সমস্ত আশ্চর্য্য কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম - শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দু জগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইত। মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি, শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম্র, অগুরুচন্দন মিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন অতি বিস্তীর্ণ অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত—আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দু-সংসার আমার বালিকা হৃদয়ের নিকট একটি পরম রমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহী লোকের লড়াই বাধিল আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, এইবার গোখাদক গোরালোককে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর একবার হিন্দুস্থানে হিন্দু মুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে।

আমার পিতা গোলাম কাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজজাতিকে কোন একটি বিশেষ কুটুম্ব সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না—আমি কোম্পানি বাহাদুরের সহিত লড়িব না।

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দু মুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মত সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, নবাব সাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।

পিতা বলিলেন, সে সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।

কেশরলাল কহিলেন, ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না—কহিলেন, যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত কিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ্ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন—এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে জিলার কমিশনার সাহেব লাল-কুর্ত্তি গোরা লইয়া আকাশে ধূলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলামকাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ সংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল, যে তাঁহার কথায় তাহারা ভাঙ্গা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারী হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মত বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধূলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চীৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল-আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত

করিয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত—কিন্তু সে দিন স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম—খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল,—সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনাতীরের আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকি-নন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদস্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারম্বার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম—আমার উত্তপ্তললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবামাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল—এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্ত্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণতল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম—শুনিলাম, নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন "জল।"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজা হইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের অ..ায়ালিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বাম চক্ষু নঃ করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেঃ আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনা হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর জল দিব? কেশরলাল কহিলেন. কে তুমি? আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, অধীন আপনার ভক্ত সেবিকা। আমি নবাব গোলামকাদের খাঁ কন্যা।—মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যু কালে তাঁহা ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জ্জ করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বেইমানের কন্যা, বিধর্ম্মী! মৃত্যু কালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিলি!" এ বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোলদেশে দক্ষিণ করতলের আঘা করিলেন—আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী—প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি—তখনো বহিরাকাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্য্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই—সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে আমা সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হই লাম।

আমি নির্ব্বাপিত-সিগারেটে এতক্ষণ মোহমুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম, কি, ভাষা শুনিতেছিলাম, কি, সঙ্গীত শুনিতেছিলাম জানি না—আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না—হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম—জানোয়ার !

নবাবজাদী কহিলেন—কে জানোয়ার ! জানোয়ার কি মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে !

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম—তা বটে। সে দেবতা।

নবাবজাদী কহিলেন—কিসের দেবতা ! দেবতা কি ভক্তের একাগ্র চিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে !

আমি বলিলাম তাও বটে ! বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন—প্রথমটা আমার বড় বিষম বাজিল। মনে হইল সমস্ত বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্ব্বিকার পবিত্র বীর ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম—হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর—তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই !

নবাব-দুহিতাকে ভূলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কি মনে করিল বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোন ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল;—তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্ত

প্রসারণ করিলাম—সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল—এব বহুকষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়া নৌকা বাঁধা ছিল—পার হইবার লোকও ছিল না, পা করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশর লাল বাঁধন খুলিয়া দিল—নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্য স্রোতে গিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল—আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লই সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে যোড়কর করিয়া সেই নিস্ত নিশীথে সেই চন্দ্রালোক-পুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকাল বৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জ্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনে ঊর্দ্ধে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কন কেল্লার চূড়াগ্রভাগ—সকলে নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল;—সেই নিশীথে গ্র চন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিনভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্য সুন্দর শান্ত শীত অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছি করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও বা কাশব কোথাও বা মরুবালুকা কোথাও বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথা বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোন কথা কহিলা না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল—ইহার পরে ঘটনাবলী ?ড় জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া ?লিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন্ চলিয়াছিলাম সে কি ?ার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি!—কোথায় আরম্ভ করিব, ?কাথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত ?াহিনীকে কি উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে ?কছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়!

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ইহা বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য ?সম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের ?ংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু তাহা কাল্প-?নক;—একবার বাহির হইয়া পড়িলে একটা চলিবার পথ থাকেই। ?স পথ নবাবী পথ নহে, কিন্তু পথ—সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া ?াসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখা প্রশাখায় ?ভক্ত, তাহা সুখে দুঃখে বাধা বিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাব-দুহিতার সুদীর্ঘ ?মণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না—হইলেও সে সব কথা বলিবার ?ৎসাহ আমার নাই। এক কথায়, দুঃখ কষ্ট বিপদ অবমাননা ?নেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। ?তসবাজির মত যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। ?তক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল ?—আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের চরম সুখের আলোক-শিখাটি ?নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড় পদার্থের ন্যায় ?ড়িয়া গিয়াছি—আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই ?মার কাহিনী সমাপ্ত।

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘা নাড়িলাম ; এখানে ত কোন মতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চু করিয়া থাকিয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলাম—বেয়াদবি মাপ করিবে॰ শেষ দিককার কথাটা আর অল্প একটু খোলসা করিয়া বলি(অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম আমার ভাঙ্গা হিন্দী(ফল হইয়াছে। যদি আমি খাষ্ হিন্দীতে বাৎ চালাই(পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙ্গি না কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জা' সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান—সেই(একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—কেশরলালের সংবাদ আ প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোন মতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করি(পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্ল চ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনো পূর্ব্বে কখনো পশ্চিমে, কখ(ঈশানে কখনো নৈঋতে বজ্রাঘাতের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গি পড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দ স্বামীকে পি সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলা ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত আমি ভক্তিভরে শাস্ত্র শিক্ষা করিতাম এবং মর্ম্মান্তিক উদ্বে(সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করি নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাও গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূর দূ

স্তর হইতে যে সকল বীরমূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না। গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে তীর্থে তীর্থে মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি কোথাও কেশরলালের কোন সন্ধান পাই নাই। দুই একজন যাহারা তাহার নাম জানিত কহিল, সে, হয় যুদ্ধে, নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে। আমার অন্তরাত্মা কহিল কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই—সেই ব্রাহ্মণ সেই দুঃসহ জলদগ্নি কখনো নির্ব্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন্ দুর্গম নির্জ্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্দ্ধশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে—মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথার কোন উল্লেখ নাই· তাহার একমাত্র কারণ, তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে,—কারণ, তৎপূর্ব্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে। একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি—কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি

সেই যে দেখিয়াছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎস্না নিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্য স্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম—ব্রাহ্মণ নির্জ্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দ্দেশ মহা রহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে—তাহার কোন সঙ্গী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোন আবশ্যক নাই, সেই নির্ম্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ;—আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম—কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—ভুটিয়া লেপ্‌চাগণ ম্লেচ্ছ—ইহাদের আহার ব্যবহারে আচার বিচার নাই- ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চ্চনাবিধি সকলি স্বতন্ত্র;—বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্ব্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতি দূরে।

তাহার পরে আর কি বলিব! শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়—সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কি ব্যাখ্যা করিব!

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—কি দেখিলেন ?

নবাবপুত্রী কহিলেন, দেখিলাম বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র পৌত্রী লইয়া ম্লান বস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম—আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংশ্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে ?

নবাব কন্যা কহিলেন—আমি কি তাহা বুঝি না ? কিন্তু এতদিন আমি কি মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম ! যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র ? আমি জানিতাম তাহা ধর্ম্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোলো বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্না নিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলাম ? হায় ব্রাহ্মণ, তুমিত তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্ত্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্ত্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব ?

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, নমস্কার বাবুজি!—মুহূর্ত্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল—সেলাম বাবু সাহেব! এই মুসলমান অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোন কথা বলিতে না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রি শিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকা রাশির মধ্যে মেঘের মত মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাব বালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদগদ একাগ্র মূর্ত্তি দেখিলাম—তাহার পরে এই দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা-রোডের প্রান্তে প্রবীনার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্নহৃদয়ভারকাতর নৈরাশ্য মূর্ত্তিও দেখিলাম—একটি সুকুমার রমণী-দেহে ব্রাহ্মণ মুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষ-জনিত বিচিত্র ব্যাকুল সঙ্গীত-ধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দ্দু ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্ম্মল আকাশ ঝল ঝল করিতেছে—ঠেলা গাড়িতে ইংরাজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাঙ্গালীর গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম—এই সূর্য্যালোকিত অনাবৃত জগৎ দৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্ব্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম্র ভূরি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়া-

ছিলাম—সেই মুসলমানব্রাহ্মণী সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই হয়ত সত্য নহে।

কণ্ঠরোধ। *

অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙ্গালীর ভাষা, দুর্ব্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা তথাপি সে ভাষাকে আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

কারণ যাহাই হোক্ না কেন যে ভাষা আমাদের শাসনকর্ত্তারা জানেন না, এবং যে ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা আমরা কোন্ ভাব হইতে কি কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি সুদুঃসহ বেদনা হইতে উচ্ছ্বসিত, না, দুর্ব্বিষহ স্পর্দ্ধা হইতে উদ্গীরিত তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে, এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি বোধ করি নির্ব্বোধও নহি, উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও

---

* সিডিশন বিল পাস্ হইবার পূর্ব্ব দিনে টৌন্‌হল্ মীটিংয়ে পঠিত।

আমার নাই ; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সামানায় ঘাটি বাঁধিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,—এবং আমি ঠিক্ কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্ত্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্ত্তার নিকটও অস্পষ্ট,—কারণ কর্ত্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে চালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক আকা উল্কাপাতের ন্যায় অযথাস্থানে দুর্ব্বলজীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসম সচকিত করিয়া তুলিতে পারে।

এমনস্থলে সর্ব্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এ আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্ত্তব্যক্ষেত্র হইতে যথে দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্বুদ্ধি অবলম্ব করিবেন তাহ রও দুই একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে,—আমাদে দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী যাঁহারা বিলাতী সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়ন গণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাক্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন;—সে সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্ব্বাক্ বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" তথাপি শ্মশান যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তখন ভীত বন্ধুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করিতে হইবে।

অবশ্য, রাজা বিমুখ হইলে আমরা ভয় পাইব না আমাদের এমন স্বভাবই নহে কিন্তু রাজা যে কেন আমাদের প্রতি এতটা

ভয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আমাদিগকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিচ ইংরাজ আমাদের একেশ্বর রাজা, এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এদেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। অতি দূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ, প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎস্পন্দর চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়;—সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

বাহিরের প্রবল শত্রুসম্বন্ধে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতেও পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জানা নাই।

কিন্তু আমরা আমাদিগকে জানি। আমরা যে কোন অংশেই ভয়ঙ্কর নহি সে বিশ্বাস আমাদের বদ্ধমূল। এবং যতক্ষণ সে বিশ্বাস আমাদের নিজের মনে নিঃসংশয়ভাবে দৃঢ় থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ঙ্কারিতাও সর্ব্বতোভাবে দূরীকৃত।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্য্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনা চেষ্টায় বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ঙ্কর! আশ্চর্য্য! ইহা আমরা পূর্ব্বে কেহ সন্দেহই করি নাই!

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন

নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ-প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারেনা—আমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর!

একদিন শুনিলাম অপরাধী-বিশেষকে সন্ধান পূর্ব্বক গ্রেফ্‌তার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্মেণ্ট সাক্ষীসাবুদ বিচার বিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা সহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, পুণা বড় ভয়ঙ্কর সহর! ভিতরে ভিতরে না জানি কি ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে!

আজ পর্য্যন্ত সে ভয়ানক কাণ্ডের কোন অন্ধিসন্ধি পাওয়া গেল না।

কাণ্ডটা সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক্ হইয়া বসিয়া আছি এমন সময় তারের খবর আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মত পড়িয়া নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মত সমস্ত বম্বাই প্রদেশের মাথার উপরে কালোমেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল এবং জবর্দস্ত শাসনের ঘনঘন বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আয়োজন আড়ম্বরে আমরা ভাবিলাম, ভিতরে কি ঘটিয়াছে জানিনা, কিন্তু বেশ দেখিতেছি, ব্যাপারটি সহজ নহে! মাহারাট্টারা বড় ভয়ঙ্করজাত।

একদিকে পুরাতন আইন শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্ম্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে! একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে! আমরা এতই ভয়ঙ্কর!

আমরা এতকাল বিপুলা পৃথিবীকে অচলা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং এই প্রবলা বসুন্ধরার প্রতি আমরা যতই নির্ভর ও যতই উপদ্রব করিয়াছি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত প্রকাণ্ড শক্তিতে অনায়াসে বহন করিয়াছেন। একদিন নববর্ষার দুর্য্যোগে মেঘাবৃত অপরাহ্নে অকস্মাৎ আমাদের সেই চিরনির্ভরভূমি জানিনা কোন্ নিগূঢ় আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার সেই মুহূর্ত্তকালের চাঞ্চল্যে আমাদের বহুকালের প্রিয় পুরাতন বাসস্থানগুলি ধূলিসাৎ হইল।

গবর্মেণ্টের অচলা নীতিও যদি অকস্মাৎ সামান্য অথবা অনির্দ্দেশ্য আতঙ্কে বিচলিত ও বিদীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার শক্তি ও নীতির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের চিরবিশ্বাস হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই আঘাতে প্রজার মনে ভয়সঞ্চার হওয়া সম্ভব কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রতিও াহার অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। ঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনিই মনে উদয় হয় আমি না জানি কি!

সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদের একটুখানি সান্ত্বনা আছে। কারণ, সম্পূর্ণ নিস্তেজ নিঃসত্ত্ব জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা যেমন অনাবশ্যক, তেমনি তাহাকে শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব। আমাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে ন্যায় অন্যায় বিচার অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া এ কথা আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়ত আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল মূঢ়তাবশতঃ আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্মেণ্ট্ যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে, আমরা মশা নহি,—অন্ততঃ মরা মশা নহি!

আমাদের স্বজাতির অন্তরে একটা প্রাণ, একটা শক্তির সঞ্চার-সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে পরমানন্দের বিষয় একথা অস্বীকার করা এমন সুস্পষ্ট কপটতা, যে, তাহা পলিসি স্বরূপে অনাবশ্যক এবং প্রবঞ্চনা স্বরূপে নিষ্ফল। অতএব গবর্মেণ্টের তরফ হইতে আমাদের কোনখানে সেই শক্তির আবিষ্কার ও স্বীকার দেখিতে পাইলে আমাদের নিরাশ চিত্তে কিঞ্চিৎ গর্ব্বের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না!

কিন্তু, হায়, এ গর্ব্ব আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক,—শুক্তির মুক্তার ন্যায় ইহা আমাদের পক্ষে ব্যাধি,—উপযুক্ত ধীবররা আমাদের জঠরের মধ্যে কঠোর ছুরিকা চালাইয়া এই গর্ব্ব নিঃশেষে বাহির করিয়া লইয়া নিজেদের রাজমুকুটের উপর স্থাপন করিবেন। ইংরাজ নিজের আদর্শে পরিমাপ করিয়া আমা-দিগকে যে অযথা সম্মান দিতেছেন সে সম্মান হয়ত আমাদের পক্ষে একই কালে পরিহাস এবং মৃত্যু! আমাদের যে বল সংশয় করিয়া গবর্মেণ্ট্ আমাদের প্রতি বল-প্রয়োগ করিতেছেন সে বল যদি আমাদের না থাকে তবে গবর্মেণ্টের গুরুদণ্ডে আমরা চূর্ণ হইয়া যাইব,—সে বল যদি যথার্থ থাকে তবে দণ্ডের তাড়নে তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ় এবং গোপনে প্রবল হইবে।

আমরা ত আমাদিগকে জানি, কিন্তু, ইংরাজ আমাদিগকে জানেন না। না জানিবার ১০১ কারণ আছে—তাহা বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কথাটা এই তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্ব্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিম-দেশী। আমাদের মধ্যে যে কি হইতে কি হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্ খানে ধোঁয়াইয়া ওঠে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেই জন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের

মধ্যে ভয়ঙ্করত্বের আর কোনও লক্ষণ নাই কেবল একটি আছে, আমরা অজ্ঞাত। আমরা স্তন্যপায়ী উদ্ভিজ্জাশী জীব, আমরা শান্ত সহিষ্ণু উদাসীন কিন্তু তবু আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ, আমরা প্রাচ্য, আমরা দুর্জ্ঞেয়।

সত্য যদি তাহাই হইবে, তবে, হে রাজন্, আমাদিগকে আরও কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি তাহা রোধ করিয়া ফল কি?

সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্ব্বাক্ নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ঙ্কর নহে? সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ সেই জন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে? সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনও কোনও ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে, তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্ব্বাঙ্গের কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কেয়ূর, তাহার বিচিত্রভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু না কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজ হস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে কিন্তু পাহারার কি সুবিধা হইবে জানি না!

কিন্তু পাহারা দিবার ভার যে জাগ্রত লোকটির হাতে, পাহারা দিবার প্রণালীও তিনিই স্থির করিবেন; সে সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে নিরতিশয় ধৃষ্টতা এবং সম্ভবতঃ তাহা নিরাপদও নহে। অতএব মাতৃভাষায় আমার এই দুর্ব্বল উদ্যমের মধ্যে সে দুশ্চেষ্টা নাই। তবে আমার এই ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, ব্যর্থ অথচ বিপদসঙ্কুল বাচালতা কেন? সে কেবল, : প্রবলের ভয় দুর্ব্বলের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর তাহাই স্মরণ করিয়া!

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছু দিন হইল একদল ইতর জাতীয় অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরাজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁট্‌টি মারিলেই পাট্‌খেলটি খাইতে হয়, কিন্তু মূঢ়গণ ইঁট মারিয়া পাট্‌খেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিষ খাইয়াছিল। অপরাধ করিল দণ্ড পাইল কিন্তু ব্যাপারটা কি আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমানগণ সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদ পত্র লেখেও না;—একটা ছোট বড় কাণ্ড হইয়া গেল অথচ এই মূক নির্ব্বাক্ প্রজা সম্প্রদায়ের মনের কথা কিছুই বুঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন্ রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্দ্ধচন্দ্র-শিখরী রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত তাহার সম্ভবপর সহ[কারি] কারণকে শাখাপল্লবান্বিত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই আতঙ্কচকিত ইংরাজি কাগজে কেহ বলিল, ইহা কন্‌গ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা, কেহ বলিল মুসল[মান]

ানদের বস্‌তিগুলা একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক্, কহ বলিল এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈল-শিখরের উপর বড় লাট্ সাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া াকা উচিত হয় না।

রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয় স্থান—এবং প্রবল ্যাক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্ব্বল ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু!

রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া াকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা। তাহাতে করিয়া মাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে ত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুরপনেয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরো-র খরধার হইয়া উঠিবে এবং প্রজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত নির্ব্বাক্ নৈরাশ্যে বিষতিক্ত হইতে থাকিবে। আমরা ইংরাজের াস্ত অধীন প্রজা, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার দাসত্ব ব না। আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব ইংরাজ ার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে রবেন না। তাঁহারা রাগ করিয়া আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে রন, কিন্তু বেদনার মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিবে। রণ, সে বিধির নিয়ম—পিনালকোডে তাহার কোন নিষেধ ই। অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে াকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজা প্রজার ম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত ইতেছি।

কিন্তু এই অনির্দ্দিষ্ট সংশয়ের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অমঙ্গল হে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অশুভ আছে।

মানবচরিত্রের উপরে পরাধীনতার অবনতিকর ফল আছেই

তাহা আমরা ইংরাজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। অসত্যাচরণ, কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ হইয়া তাহার আত্ম-সম্মানকে তাহার মনুষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বাধীনতাপূজক ইংরাজ আপন প্রজাদিগের অধীনদশা হইতে সেই হীনতার কলঙ্ক যথাসম্ভব অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে মনুষ্য-ত্বের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা বিজিত তাঁহারা বিজেতা, আমরা দুর্ব্বল তাঁহারা সবল ইহা তাঁহারা পদে পদে স্মরণ করাইয়া রাখেন নাই। এতদূর পর্য্যন্ত ভুলিতে দিয়া-ছিলেন যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকার;—বিনা দোষে ও বিনা বিচারে দণ্ড না পাওয়ার যেমন অধিকার আমার আছে ইহাও তেমনি।

আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি দুর্ব্বলের কোন অ কারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্য-মাত্রেরই প্রাপ্য মনে করি ছিলাম তাহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মা আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চা করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্ব্বানুভব করিবার কে কারণ নাই,—দোষ করিবার ও বিচার হইবার পূর্ব্বেই যে অ কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনও গৌরব নাই।

ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এই সত্য সর্ব্বদা অনুভব করা রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। মনুষ্য, অবস্থার পার্থ-ক্যের মাঝখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অসমানতার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসিত ও শাসনকর্ত্তার মধ্যবর্ত্তী শাসনশৃঙ্খলটাকে সর্ব্বদা

অঙ্কার না দিয়া সেটাকে আত্মীয় সম্বন্ধবন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জেতৃজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতাসূত্রে অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী ছিলাম। আমরা দুর্ব্বলজাতির হীনভয় ও কপটতা ভুলিয়া মুক্ত হৃদয়ে উন্নত মস্তকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিতেছিলাম।

যদি চ উচ্চতর রাজকার্য্যে আমাদের স্বাধীনহস্ত ছিল না, ত াপি নির্ভীকভাবে পরামর্শ দিয়া স্পষ্ট বাক্যে সমালোচনা ক রিয়া আপনাদিগকে এই বিপুল ভারত রাজ্যশাসনকার্য্যের অ বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাহার অন্য ফলাফল বিবেচনা করি-ব সময় নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়িয়া উ য়াছিল। আমরা জানিতাম আমাদের স্বদেশ-শাসনের বিপুল ব্যা ারে আমরা অকর্ম্মণ্য নিশ্চেষ্ট নহি—ইহার মধ্যে আমাদেরও ক ব্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এই শাসন-কার্য্যের উপর যথ : প্রধানতঃ আমাদের সুখ দুঃখ আমাদের শুভ অশুভ নির্ভর ক রতেছে, তখন তাহার সহিত আমাদের কোনও মন্তব্য কোনও ব ব্য কোনও কর্ত্তব্য বন্ধনের যোগ না থাকিলে আমাদের দীনতা ত াদের হীনতার আর অবধি থাকে না। বিশেষতঃ আমরা ই ংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছি, ইংরাজি সাহিত্য হইতে ই ংরাজ কর্ম্মবীরগণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে জ াগিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারেই নিজের শুভ-স াধনে আমাদের নিজের স্বাধীন হস্ত থাকার যে পরম গৌরব তা হা আমরা অনুভব করিয়াছি এবং উদার ইংরাজশাসনে তাহার

চর্চ্চা করিয়া আমরা উত্তরোত্তর জীবনের সার্থকতা প্রাপ্ত হই-য়াছি;—আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাব-প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই,—রাজকার্য্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচন সম্বন্ধও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার পঙ্কের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকি, নয়, কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদ-তলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থ-বেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দেশের দুর্দ্দশা পরাকাষ্ঠা প্রা ‍ ‍হইবে; যে সম্বন্ধের মধ্যে সত্য ও প্রীতি বিরাজ করিতে ‍ সেখানে একমাত্র ভয় আসিয়া অধিষ্ঠান করিবে;—রাজার প্রা ‍ প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে ‍ ততোধিক শোচনীয়।

এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আ‍মাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোন কোন জবরদস্ত ইংরাজ লে‍ক বলেন যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভাল। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরাজশাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাব‍ ‍ যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গীর যে বিচিত্রলীলা মনোহর শ্রী ‍ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া? দুই শত বৎস‍ পরিচয়ের পরে আমাদের মানব সম্বন্ধের এই কি অবশেষ?

বৃটিশ গায়েনা।

প্রথম পরিচয়।

ভ্রমণ বিবরণ লিখিতে হইলে প্রথমে ভ্রমণ করা আবশ্যক, তাহার পরে বিবরণ লিখিবার লিপিশক্তি থাকাও চাই। এমন কি, যদি কলমের জোর থাকে তবে ভ্রমণ না করিলেও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনার বিশেষ ব্যাঘাত হয় না বরঞ্চ স্ফূর্ত্তি হয়, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে।

বর্ত্তমান লেখক যে পরিমাণে ভ্রমণ করিয়াছেন সে পরিমাণে প্রবন্ধরচনা অভ্যাস করেন নাই—সেই জন্য তিনি ভারতীর রবারে কুণ্ঠিতচিত্তে প্রবেশ করিতেছেন। ভরসার মধ্যে এই ব. যে দেশের বর্ণনায় তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা বাঙ্গালী ঠিকের নিকট নূতন এবং অপর পক্ষে ভারতবর্ষের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

বৃটিশ গায়েনা স্থানটা কোথায় তাহা নিশ্চয়ই সকলে জানেন—কিন্তু তথাপি যদি তাহা খোলসা করিয়া লিখিয়া দিই তবে বোধ করি অনেকের পক্ষে নূতন জ্ঞান লাভ হইবে।

আমার গায়েনা যাইবার যখন কথা হইতেছিল তখন আমার পরিচিত অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আপনি না কি আফ্রিকায় যাইতেছেন?" আমি ফিরিয়া আসিলেও অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'আফ্রিকা আপনার কেমন লাগিল?" আমাকে উত্তর দিতে হইয়াছিল "বৃটিশ গায়েনা আফ্রিকার অন্তর্গত নিউগিনির নামান্তর নহে—পরন্তু তাহা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত।"

এমন সুদূরবর্ত্তী ধরণীপ্রান্তের কথা লিখিতে বসিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না—কারণ, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমি পদার্পণ করিয়াছিলাম বলিয়াই সে জায়গাটা বিশেষ গৌরবান্বিত হয় নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, চতুঃসহস্রাধিক ভারতীয় শ্রমজীবী প্রতিবৎসর বৃটিশ্ গায়েনায় আনীত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের সংখ্যা এক লক্ষেরও উপর হইবে। ইহাদের অনেকেই বৃটিশ গায়েনাকে চিরবাসস্থানরূপে বরণ করিয়াছে।

গায়েনার পূর্ব্বে ও উত্তরে আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে বেনিজুয়েলা এবং দক্ষিণে ব্রাজিল। ইহা তিন অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ অংশ ফরাসীদিগের অধিকৃত এবং ফ্রেঞ্চগায়েনা না অভিহিত। ইহার রাজধানী কেয়ান্। এই নগরীর নামা সারেই য়ুরোপীয় ভাষায় লঙ্কামরিচের নাম কেয়ান হইয়াছে। মধ্য অংশ ওলন্দাজদিগের অধিকৃত এবং ডাচ্ গায়েনা নামে প্রসিদ্ধ। তাহার প্রধান নগরী স্থরীনাম্। উত্তরাংশে ইংরাজ রাজ্য এবং তাহা বৃটিশ গায়েনা নামে পরিচিত।

মানচিত্র খুলিলে দেখা যায় সিংহল দ্বীপ এবং বৃটিশ গায়েনা বিষুবরেখার কিঞ্চিৎ উত্তরে প্রায় এক অক্ষাংশে অবস্থিত—সুতরাং উভয়ের জলবায়ুর অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

বৃটিশ্ গায়েনার তিনটি বিভাগ। উত্তরে এসিকুইবো। দক্ষিণে বার্‌বীস্। মধ্যে ডেমেরারা। রাজধানী জর্জ্জ্‌টাউন্ এই ডেমেরারা কাউণ্টিতে অবস্থিত বলিয়া সমস্ত বৃটিশ্ গায়েনাকে কখন কখন ডেমেরারা বলা হইয়া থাকে।

এই কাউণ্টিত্রয়ের নাম তিনটি বৃহৎ নদীর নামে রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে এসিকুইবো সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই এসি-

কুইবো নদীর ঝরণাদিতে আজ কাল যথেষ্ট স্বর্ণ পাওয়া যাই-তেছে ও বৃটিশ গায়েনার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সংবাদ-পত্র-পাঠকেরা জানেন এই নদীর তীরস্থ যে সমুদয় স্থানে সুবর্ণ পাওয়া যায় তাহার সীমানা লইয়া বেনিজুয়েলা গবর্মেণ্টের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে।

মরকতশ্যামলা বৃটিশ্ গায়েনার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। ইহার উপকূল ভাগ সমতল এবং সমুদ্রজলোচ্চতা হইতে কয়েক ফুট নিম্নে অবস্থিত। কিন্তু অভ্যন্তর প্রদেশ জলপ্রপাতমুখরিত ছোটবড় পাহাড়ে পর্ব্বতে সমাকীর্ণ। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জল-প্রপাত কাইটোর ঝর্না বৃটিশ গায়েনার এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে নিপতিত। এই সকল শৈলসংলগ্ন বনভূমি বহুদূরবিস্তৃত এবং এত নিবিড় যে অনেক স্থানে সূর্য্য কিরণের অগম্য। বক্ষ্যমান ভ্রমণ বৃত্তান্তের যথাস্থানে এই সকল নগনদীবনানীর বর্ণনা করিবার অভিপ্রায় রহিল।

সাউথাম্টন্ পরিত্যাগের প্রায় ১২ দিন পরে আমাদের জাহাজ বারবেডস্ নামক দ্বীপে উপস্থিত হয়। ইতিমধ্যে আর কোথাও স্থল দেখিতে পাই নাই। আমরা যে পৃথিবীর শীতমণ্ডলের সীমা অতিক্রম করিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিকারের মধ্যে প্রবেশ করি-য়াছি আবহাওয়ার উত্তাপ ব্যতীত এতদিন তাহার আর কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় পাই নাই। বারবেডস্ দ্বীপে পৌঁছিয়া সহসা প্রচুরপুষ্পপল্লবভূষণা তপ্তসূর্য্যকরালসা শ্যামলাম্বরা নিদাঘলক্ষ্মীর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য আমার সম্মুখে অজস্র বিস্তীর্ণ দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইল।

বারবেডস্ পরিত্যাগের দুই দিন পরে রাত্রিতে আমরা ডেমে-রারা নদীতে প্রবেশ করি। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া চারি-

দিকে তাকাইলাম মনে হইল যেন বঙ্গোপসাগর হইতে ঠিক গঙ্গার মোহানায় প্রবেশ করিতেছি। নদীর জল অত্যন্ত অপরিস্কার। সমুদ্রকূল এবং নদীর দুইতীর ঘন হরিদ্বর্ণ বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন। শুধু বামপার্শ্বে গায়েনার রাজধানী জর্জ্‌টাউন দেখিয়া দেশটাকে নূতন বলিয়া প্রতীতি হইল।

জর্জ্জটাউনের ঘরবাড়িগুলি প্রায় সমস্তই কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং গৃহছাদ ঢালু। জাহাজ হইতে যেখানে নামিলাম সহরের সে অংশ জনাকীর্ণ। বিশেষতঃ ডাকের জাহাজ আসিয়াছে বলিয়া অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। লোকও নানা বর্ণের নানা রকমের। একদিকে শ্বেতকায় ইংরাজ নরনারী, অপর দিকে তাহাদের পার্শ্বে ঘোর কৃষ্ণ কোক্‌ড়া চুল নিগ্রোগণ রহিয়াছে। আবার ইহাদের মিশ্রণে যাহারা জন্মিয়াছে তাহাদের বর্ণ এবং আকৃতি বিচিত্র। তাহাদের অনেকের বর্ণ শুভ্র কিন্তু চুল ঘন কোঁকড়া ঠোঁট মোটা, এবং নাক চ্যাপ্‌টা। ইহাদিগকে এখানে সচরাচর হোয়াইট্ নিগার বলিয়া থাকে। ভিড়ের মধ্যে আবা আর এক জাতীয় লোক দেখা গেল, যাহাদিগকে দেখিয়া প্রবাসীর হৃদয় স্বভাবতই আকৃষ্ট হইল, তাহারা আমা স্বদেশীয়।

আমি যেদিন জর্জ্জটাউনে পঁহুছিলাম, কার্য্যবশতঃ তাহা পরদিনই আমাকে বারবীস্ নামক স্থানে যাইতে হইল। বারবী একটি ক্ষুদ্র সহর। সুতরাং স্থানীয় লোকেরা আমাকে দেখি য়াই বুঝিতে পারিলেন আমি নূতন অভ্যাগত। একদিন আমি কয়েকখানি চিঠিপত্র পোষ্ট্ করিবার নিমিত্ত পোষ্ট্ অফিসে গিয়াছি। যাঁহার নিকট টিকিট ক্রয় করিলাম তিনি একজন কৃষ্ণকায়, অর্থাৎ নিগ্রো। (নিগ্রোদিগকে এখানে সাধারণত

Black people বলা হইয়া থাকে)। আমি টিকিট লইয়া চিঠিতে লাগাইতেছি এমন সময়ে পোষ্ট্ অফিসের এই কেরাণী মহাশয় আমাকে অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "Excuse me sir, are you a coolie ?" অর্থাৎ মহাশয়, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, আপনি কি একজন কুলি ?" আমি প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্! কহিলাম বলেন্ কি ? "Whät do you mean ?" আমার স্বর শুনিয়া ও মুখভাব দেখিয়া লোকটা কিছু অপ্রস্তুত হইল। বলিল "Beg your pardon, I mean are you an Indian" ক্ষমা করিবেন, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি কি ভারতবাসী ?" বলা বাহুল্য আমি সেই কেরাণীর উপর রাগ প্রকাশ না করিয়া তাহাকে কুলি শব্দের প্রকৃত অর্থ ও ব্যবহার বুঝাইয়া দিলাম।

এইখানে প্রসঙ্গত আর একটি ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। একদিন এখানকার প্রচলিত ফেটন্ জাতীয় একখানি ঠিকা গাড়ি করিয়া আমার হোটেলে যাইতেছি ইতিমধ্যে হঠাৎ আমার কোচ্‌ম্যান্ "বাবু বাবু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। যুগপৎ দুইটি প্রশ্ন মনে উঠিল। প্রথমতঃ আমাদের দেশের ভদ্রলোকদিগকে বাবু সম্বোধন করিতে হয় তাহা এই নিগ্রো জানিল কি করিয়া ? দ্বিতীয়তঃ লোকটা কাহাকে সম্বোধন করিয়া চীৎকার করিতেছে ? যদি আমাকে সম্ভাষণই উদ্দেশ্য হয় তবে এত চীৎকার করিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমি কোন প্রকার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই এ সমস্যার কতক মীমাংসা হইল। একটি বৃদ্ধ ভারতবর্ষীয় কুলী রাস্তা পরিস্কার করিতেছিল, দেখা গেল তাহাকেই সাবধান করিবার নিমিত্ত গাড়োয়ান চীৎকার করিল। আমাদের প্রাচীন মহাদেশের বিপ-

রীত খণ্ডে এই এক বিপরীত ব্যাপার দেখা গেল যে, লোকে বাবুকে কুলি এবং কুলিকে বাবু বলিতে কুণ্ঠিত হইল না।

আমি বার্বীসে পৌছিয়াছি শুনিয়া সেইদিন সন্ধ্যাবেলা কয়েকজন ইণ্টর্প্রিটর্ হোটেলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ইহারা সকলেই জাতিতে ভারতবর্ষীয়। ইহাদের দুইজন অতি বাল্যকালে ভারতবর্ষ হইতে পিতামাতার সহিত এদেশে আসিয়াছে। আর দুইজনের গায়েনাতে জন্ম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে আর একজন ছিল বয়সে কিছু প্রাচীন। ইনি কিছু বেশি বয়সে এদেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের সকলেরই পরিধানে বিলাতী পোশাক, এবং আমার সহিত ইঁহারা ইংরাজিতেই আলাপ আরম্ভ করিল। কেবল সেই বৃদ্ধাকে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করিতে হইয়াছিল কারণ তাহার ইংরাজি বুঝিতে পারি এমন শক্তি আমার তখনো জন্মে নাই।

ইহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এদেশে কুলিকে সম্বোধন করিবার সময় বাবু কিম্বা স্বামী শব্দ ব্যবহৃত হয় কদাচিৎ বা মহারাজ শব্দও প্রয়োগ হইয়া থাকে। কুলিমাত্রেই স্বামী সম্ভাবণে কেন আহূত হইতে পারে তাহার কারণ আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজ প্রদেশ হইতেই বৃটিশ গায়েনার অধিকাংশ কুলি প্রেরিত হইত। পাঠকগণ অবগত আছেন মাদ্রাজি অধিকাংশ নামের সহিত স্বামী শব্দের যোগ আছে। যথা রামস্বামী, মথুস্বামী, বীরস্বামী ইত্যাদি। এই সকল মাদ্রাজি নামের কল্যাণে ভারতবাসীমাত্রেই স্বামী উপাধি লাভ করিয়াছে।

মহারাজ খেতাবটা যে গবর্মেণ্ট্ প্রদত্ত অথবা পূর্ব্বপুরুষের গৌরবসূচক নহে তাহা পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য। গায়েনাতে

এমন অনেক কুলি আছে যাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে এবং ভিন্ন জাতীয় কুলিদিগের পৌরোহিত্য করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহ করে। সকলেই জানেন হিন্দুস্থানে পশ্চিমের ব্রাহ্মণেরা মহারাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃটিশ গায়েনায় এই মহারাজ শ্রেণীর উচ্চ মেজাজ এবং কুলিসমাজে তাহাদের সম্মান ও প্রভুত্ব দেখিয়া গায়েনার ইংরাজি ভাষায় একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে "Playing the mohraj" অর্থাৎ মহারাজগিরি ফলানো।

কবিতা-হরিণী।

আমার মানস-বনে কবিতা-হরিণী
সারাদিন খেলিতেছে ছুটিয়া ছুটিয়া।
নব নব ভাব তৃণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া
করিছে ভক্ষণ; যেথা অশ্রু-নির্ঝরিণী
নামিয়াছে হৃদি-শৈল বহি, সেথা আসি
সারা রাত শুয়ে থাকে; প্রভাতে যখন,
শত বিহঙ্গের কণ্ঠে বেজে ওঠে বাঁশী,
উঠিয়া সে ছুটিয়া পলায়; সুশোভন
ফুটেছে রক্তিম যেথা পুলক-গোলাপ,
সেথা তার দল ছিঁড়ি প্রাতরাস করে;
ঘন-পত্র-তরুতলে লুঠি ক্লান্তি হরে
কর্ত্তব্য-তপন যবে বর্ষে খরতাপ।
কভু যদি যাই তারে ধরিবার তরে,
লুকায় গহনে ছুটি বায়ুবেগভরে।

দিল্লীর চিত্রশালিকা।

নব্যতন্ত্রের হিসাবে হয়ত সে সূক্ষ্ম ছায়া আলোকও নাই এবং তুলিকার সে দূরানুসূচী লঘুস্পর্শও এখানে দুর্লভ, কিন্তু তথাপি আমাদের পুরাতন কলাভবনের এই লুপ্তপ্রায় চিত্রশিল্পের মধ্যে যে একটি মনোহর মোহ আছে তাহা স্বীকার না করিয়া যায় থাকা না। শুধু যে পুরাতন বলিয়া, সেকালের বলিয়াই ইহার আদর তাহা নহে; ইহার বিচিত্র সূক্ষ্ম রেখাপাত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাচ্য বর্ণবিন্যাসে যে সুন্দর কারুকার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে এমন রমণীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কদাচ লক্ষিত হয়। এবং এই কলানুসৃত নিপুণ কারুকার্য্যেই ভারতবর্ষের শিল্পীজনচিত্তে এই সুরঞ্জিত চিত্রফলক এতদিন ধরিয়া এমন অম্লান আদর্শে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলার সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্পই—না ভাবে বিশেষ ঐক্য, না বর্ণবিন্যাস ও রচনাপ্রণালী একবিধ; এমন কি উভয়বিধ রচনার অন্তর্নিহিত প্রতিভার মধ্যেও যেন বহু দেশ ও বহুতর সমুদ্রের ব্যবধান। প্রাচ্য জীবনপ্রবাহেরই মত এই চিত্রার্পিত জীবনস্রোত রূপে বর্ণে আলোকে, বিচিত্র মিলন বিরহ সম্ভোগে, কখনও হাসিতে, কখনও অশ্রুচ্ছ্বাসে, কখনও সুখে কখনও বেদনায়, কোথাও নিবিড় নির্জন দাম্পত্যের রমণী স্নিগ্ধচ্ছায়ে, অন্যত্র আলোকচ্ছটাবিচ্ছুরিত সহস্রসখীপরিবৃত কূজিত নৃত্যগীতরস-রভসে হিল্লোলিত ও বিহ্বলিত হইয়া মদালসময়ী মন্দগতিতে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। এবং ভারতবর্ষীয় সকল শিল্পকলারই মত ইহার অবলীলাগতিভঙ্গে শিল্পী সেই প্রাণনির্লিপ্তবৎ অনতিসচেতন রচনাকলা সকল চেষ্টার তা

অপসারিত করিয়া দিয়া কেমন একটি প্রশান্ত স্থৈর্য্য সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের নিকট ইহা স্বভাবতই রমণীয়—বিষয়গুণেও বটে; এবং আরও বিশেষতঃ ইহার রবিকরোদ্ভাসিত বর্ণাভাসে। সে ঔজ্জ্বল্য আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না। প্রতীচ্য চিত্রে স্বভাবতই তদ্দেশেরই সূর্য্যালোক দীপ্তি পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচ্যবিদ্যাশিক্ষিত নব্য আর্টস্কুলের ছাত্রের রচনায়ও আলোক-সন্নিবেশ প্রায়ই বিলাতী ছবির অনুরূপ হওয়ায় তদ্দেশীয় মৃদু আলোকেই এদেশীয় চিত্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের পুরাতন সূর্য্যালোক অবহেলালাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই। তাহা যেন কেবল এই প্রাচীন চিত্র-ফলক এবং যে বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার মধ্যে এই চিত্রকলা চিরদিন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে তাহারই বিচিত্রাঙ্গ বর্ণসঙ্গমে একান্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

সেই জন্যই, বোধ করি, এই সমস্ত দেশীয় বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার আবহাওয়ার মধ্যেই এই চিত্রগুলি সমধিক উজ্জ্বল-তররূপে প্রতিভাত হইবার অবসর পায়। বিলাতী ফ্রেম ইহার সহিত কিছুতেই বেশ শোভন সঙ্গত হয় না। এবং পণ্যশালাবৎ অগণ্য বস্তুবিস্তারবহুল টুকিটাকিকণ্টকিত আধুনিক অভ্যর্থনা-গৃহের বিলাতী শিক্ষিত-অবহেলাসজ্জিত অসঙ্গতির মধ্যে সহস্রধা প্রতিহত হইয়া ইহার মর্ম্মনিহিত সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে। এই শিল্পসৌন্দর্য্যের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘনায়মান য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু নিরর্থক বাহুল্যভার দূরে অপসারিত করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে তাহা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে।

যে গৃহভিত্তিমূলে এই ছবিগুলি বসিবে, তাহার মর্ম্মরহর্ম্ম্যতলে, চিত্রিত প্রাসাদকক্ষে যেরূপ ঘননিবিড় কোমল বিচিত্রাভপুষ্পিত পারস্য গালিচার উপরে উষ্ণীষশোভিতশির সুদীর্ঘচাপকান-নিবদ্ধবপু রাজসভাসদ্‌গণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐরূপ পুরু খাপী কুসুমসুকুমারস্পর্শ নানা পুষ্পলতাবিচিত্র গালিচার উপরে কনককারুখচিত আমেদাবাদী কিংখাবের গেলাপমণ্ডিত গুটি-কতক সুগঠিত গভীর আরাম-উপাধান বৈ আর বড় কিছু থাকিবে না। এবং লাক্ষাবিলেপচিত্রিত সহস্র বর্ণের আভানিস্যন্দী ছাদ-হর্ম্ম্যতলে দন্তিদন্তখচিত আদ্যন্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্য্যময় সুবর্ণদীপাধানে সুগন্ধী স্নেহাভিষিক্ত বর্ত্তিকাশিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ একপ্রকার লঘু স্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে।

চিত্রও যেরূপ, চতুষ্পার্শ্বিক সমস্তই তদনুরূপ হওয়াই সঙ্গত। গৃহের স্থাপত্যে আগ্রার সেই সুরম্য প্রস্তরসন্নিবেশ এবং অলিন্দের আলিসায় সেইরূপ জালিকাজের রচনা, কপাটে মহীশূরী খোদাই অথবা লক্ষ্ণৌয়ের কনকতারের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, খিলানের খাঁজে খাঁজে বিলম্বিত রবিকিরণকীর্ণ কনকঝালরের ইন্দ্রজাল-মায়া, এবং উদ্যানপ্রান্তের দূর তোরণমণ্ডপ হইতে নহবতের শেষপ্রায় স্বর্ণরেশটুকু। এবং আমরা দর্শকের দল এই রূপরস-শব্দস্পর্শগন্ধমোহময়ী চিত্রশালিকায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সভ্য প্রাচ্য রীতি অনুসারে দ্বারদেশে পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক ভব্য উষ্ণীষ চাপকান চূড়ীদার এবং তদুপরি বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুতল দিয়া বিলম্বিত সোনালী পাড়ের বারব উত্তরীয় পরি-শোভিত হইয়া গেলেই সমস্তটির সহিত সম্যক্ একীভূত হইয়া যাই

কিন্তু বাঙ্গলার পাঠকসাধারণের নিকট এ প্রাচীন চিত্রকলা বোধ করি সেরূপ সুপরিচিত নহে এবং এতদানুষঙ্গিক এই বর্ণ-গন্ধ-গীতি-সৌন্দর্য্যময়ী শোভা-সম্পদ-সুখ-বিলাস-উৎসববিচিত্রা জীবনযাত্রাও নব্য শিক্ষাগুণে বিস্মৃতপ্রায়। সেই জন্য এ সকল কথা অনেকের নিকট দুরূহ প্রহেলিকা প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কিছুদিন পশ্চিম দেশে যাপন করিয়াছেন এবং দিল্লীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে অথবা জয়পুরের কলাভবনে বিচিত্র দেশীয় শিল্পকলার মধ্যে এই মনোহারিণী চিত্রবিদ্যার পরিচয়গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভরসা করি এই সকল কথা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। কিন্তু যাঁহাদের অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার নব্য রাজধানীর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে বড় যায় না, তাঁহারা যদি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কলিকাতার রাজপথে পরেশনাথের যে উৎসবযাত্রা বাহির হয় তৎপ্রতি একটু লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন এবং কল্পনার সাহায্যে সেই হয়গজরথধ্বজাসমন্বিত বিচিত্রবেশ রম্য দৃশ্যটুকুকে যথাযথ চিত্রপটে আরোপিত করিয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহাদের মনে এই চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। তেমনি লাল নীল সোনালী বেগুণী শ্বেত পীত জরী জহরৎ ঝকমক ঝিকিমিকি, অথচ এত ঔজ্জ্বল্যেও কেমন একটি প্রশান্ত কমনীয়তা—কোথাও কোনরূপ বর্ব্বর আতিশয্য চক্ষুকে পীড়া দেয় না বা মনকে ক্লিষ্ট করে না।

আমাদের সমালোচ্য চিত্রাবলীমধ্যে গুটিকতক চিত্র আছে যাহা বিশেষরূপে এই পরেশনাথযাত্রাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধ করি, কোন্ দেশের রাজকুমারীর সহিত কোথাকার রাজপুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, নগরের প্রশস্ত রাজ-

পথ দিয়া তাই ভারে ভারে থালে থালে বিবিধ ফলমূল মিষ্টান্ন ও নানাবিধ রাজভোগ্য সামগ্রী লইয়া বৃহতী রাজবাহিনী গীতবাদ্যসহকারে বরপক্ষীয় প্রাসাদ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে পাটল শ্বেত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণের চতুরশ্ব-যোজিত স্বর্ণরথোপরি বেগুণী চন্দ্রাতপতলে নহবতখানা। এবং পুরোভাগে, এই প্রাচ্য বিলাসকলা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতেই যেন, সারঙ্গী ও সেতারে, নূপুরে বলয়ে, বাহুবিক্ষেপে ও অবলীলা দেহ-ভঙ্গীতে নিয়ত হিল্লোলিত ও মুখরিত কলাকুশলা নর্ত্তকীর মনোহারিণী লাস্যলীলা। দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ রক্ষিবর্গ—আসমানী গোলাপী শ্বেত পীত হরিদ্বর্ণের আজানুতলবিলম্বিত বসনোপরি সোনালী জরীর কটিবন্ধে নিবদ্ধ গাঢ় বেগুণী মখমলের ছোরার খাপ, স্কন্ধে স্বর্ণমণ্ডিত চারু দণ্ড, এবং তাম্বূলরাগরক্ত অধরে সচেতন পদমর্য্যাদার ঈষৎস্মিত ভাব। এবং এই সুরঞ্জিত দৃশ্যপটে পার্শ্ববর্ত্তিনী নর্ত্তকীদিগের পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিঘূর্ণিত ও বিচ্ছুরিত জরীর পাড়ের ঢাকাই মস্‌লিনের গিলাকরা পেশোয়াজের মধ্য হইতে ঈষদ্ব্যক্ত বিবিধবর্ণের চুড়ীদার পায়জামা ও পিনদ্ধ কঞ্চুলিকানিবদ্ধ সঘনস্পন্দিত কনকযৌবনমোহ সঞ্চারিত হইয়া যেন বসন্তমদোন্মত্ত বুল্‌বুলের গীতমুখরিত সিরাজ-পুরীর একখানি সুন্দর মরীচিকা রচনা করিয়াছে।

কিন্তু নিপুণ চিত্রকর এতক্ষণ ধরিয়া শুধু একটি মূক দৃশ্যে ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—তাঁহার প্রত্যেক নর নারীই সচল সজীব সহৃদয় মানুষ। এবং এই হস্ত্যশ্বরথোপকণ্ঠ বিলম্বিত ঘণ্টিকারণিত ও চারুচরণতাড়িত নূপুরশিঞ্জিত দীর্ঘ পথ তাহারা মূক ও বধিরের মত চুপ করিয়া আসে নাই, কিন্তু বহু লঘু প্রণয়পরিহাসে, অপাঙ্গের বিলোল কৌতুককটাক্ষে, চিত্র

হারী মধুর সম্ভাষণে ও সরস ভাষণপ্রসঙ্গে পরস্পরের চিত্তবিনোদন করতঃ পথশ্রম এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। এবং চিত্রেও সেটুকু অতি সুন্দররূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে।—কোথায় এক শ্যামাঙ্গী পুষ্পপেলবা বিলাসিনী পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া ললাটের স্বেদবিন্দু মোচনার্থে কখন্ একবার পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, এবং সেই শুভ অবসরের প্রলোভনটুকু সম্বরণ করিতে না পারিয়া এক চঞ্চলচিত্ত তরুণ মাহুত দূর হস্তীপৃষ্ঠ হইতেই বাহবাসূচক একটি সস্মিত সেলাম নিবেদনে নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিল, চিত্রকরের দৃষ্টি সেটুকুও অতিক্রম করে নাই। নহবতখানায় সানায়ে ফুৎকারমাত্র নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনা বাদক একদৃষ্টে সম্মুখের নৃত্যকলাকৌশল উপভোগ করিতেছিল, সেই নিবিষ্ট দৃষ্টিটুকু চিত্রকর নিঃশব্দে আপন চিত্রপটে হরণ করিয়া আনিলেন। যে খঞ্জননয়নার উৎসুক দৃষ্টি, বোধ করি কোন পরিচিত প্রিয় মুখ সন্দর্শনের আশায়, ইতস্ততঃ কিছু ঘন ঘন সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহার সুর্মাঙ্কিত কৃষ্ণ ভ্রূযুগের মনোজয়ী কুঞ্চনবিলাস এখানে তুলিকার মোহস্পর্শে ধরা দিয়াছে। এবং এই সকলগুলিতেই প্রাচ্য মুখভাবের নানাবিধ ভঙ্গী ব্যক্ত হইয়া চিত্রকলার মনোহারিতা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে।

আর একটি চিত্রে এই রাজকীয় বিবাহের বরযাত্রা বাহির হইয়াছে—রাজকীয় বরযাত্রা যেমন হইয়া থাকে, মশালে দীপালোকে আতসবাজীতে রাত্রি উজ্জ্বল এবং সহস্র উন্মুক্ত কিরীচ ও তরবারির বিচিত্র আস্ফালনে বিচ্ছুরিত হইয়া সে ঔজ্জ্বল্য দিকে দিকে ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সুগ্রীব শ্বেত অশ্বোপরি বরবেশ পরিয়া তরুণ রাজকুমার। দুই পার্শ্বে দুইজন উষ্ণীষধারী পদাতিক ময়ূরপুচ্ছের চামর ব্যজন করিতেছে এবং পশ্চাতে শুভ্রবেশ

পরিচর বৃহৎ স্বর্ণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করতঃ রাজমর্য্যাদারক্ষণে নিযুক্ত আছে। সম্মুখে পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীর দল এবং তৎসহ অশ্বপৃষ্ঠে ও পদব্রজে লাল নীল গোলাপী ঝাঁঝরী ও ফলসাই রঙ্গের বেশপরিহিত তিন চারি দল বাদক। পুরোভাগে কনকমঙ্গলঘটশ্রেণীর দক্ষিণে ও বামে চারু চতুর্দ্দোলোপরি ললিত কলিত নৃত্যকলায় শুভযাত্রানুসূচী নটীগণ ও অগ্রপশ্চাৎ রাজকীয় ধ্বজাদণ্ডচামরপ্রবাহের কনক হিল্লোল। এবং পথের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত আতসউৎস হইতে আগ্নেয় কনক চম্পকরাশি উচ্ছ্বসিত ও বর্ষিত হইয়া নীল নৈশাকাশতলে ধূমে আলোকে এক অভিনব তাম্রকপিশ গোধূলি-আভা সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে। এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল রম্যালোকে এই বিচিত্রবর্ণ বরযাত্রাভিযান যেন একখানি নাট্যশালার দৃশ্যপট—ইহার সকলই বর্ণে আভায় সৌন্দর্য্যে মোহে রমণীয় এবং সকলই নাট্যদৃশ্যবৎ অভিনব লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

নাট্যকলার সহিত ইহার কলাগত ঐক্যও যথেষ্ট। রঙ্গমঞ্চে যেমন বাস্তবকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই অভিনেতৃবর্গের স্বাভাবিক মুখশ্রী তুলিকাস্পর্শে সমধিক অভিব্যক্ত করিয়া তোলা আবশ্যক হয়—নহিলে, আমাদের মনে সেরূপ অনুকূল মোহ উৎপাদন করে না, চিত্রপটেও সেইরূপ বাহিরের বস্তুকে রেখায় ও বর্ণে হুবহু কাপি না করিয়া তাহার মর্ম্ম-নিহিত ভাব অনুসরণে অনেক সময় শিল্পীর মনঃকল্পিত শোভন সৌন্দর্য্যের যথোচিত প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। যে বৃহৎ আকাশপটে প্রকৃতির দৃশ্যাবলী চিত্রার্পিত হইয়াছে তাহা ত আর আমাদের সম্যক্ আয়ত্ত নহে এবং ক্ষুদ্র চিত্রপটের সীমামধ্যে তাহাকে অক্ষুণ্ণ সমৃদ্ধ করিয়া তোলাও অসম্ভব। সুতরাং আমাদের স্বরচিত অমিয়

উপরে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণ চেষ্টা যে অনেক সময় অসঙ্গত ও ব্যর্থ হইয়া দাঁড়ায় তাহাতে আর বিচিত্র কি! সমস্ত চতুষ্পার্শ্বের সহিত ত একটা ঐক্য চাহি। প্রকৃতিতে কোন বস্তু আমাদের মনে কেবল নিজ বর্ণ ও রেখামাত্রে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ পায় না, কিন্তু যে বিস্তীর্ণ পটের উপরে তাহা সুলিখিত সেই পটভূমির বর্ণ দৃশ্য সৌন্দর্য্য ও আনুষঙ্গিক নানা ভাবের সহিত সঙ্গত হইয়া একটি অখণ্ড সমগ্রতায় প্রতিভাত হয়। ভাবের এই অখণ্ড সমগ্রতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিতেই শিল্পীকে ক্ষেত্র বুঝিয়া নিজ প্রতিভা পরিচালনা করিতে হয়। সেই জন্যই নিপুণ চিত্রকরেরা ছোটখাট সকল খুঁটিনাটিতে প্রকৃতির বাহ্য রেখা ও বর্ণবিন্যাসটুকু মাত্র নকল না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মর্ম্মানুসারে নিজ নিজ রচনায় বর্ণবিন্যাস করিয়া থাকেন। এবং তাহাতেই আমাদের মনে সেই মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন যাহাতে সমগ্র চিত্রখানি তাহার স্বাভাবিক সঙ্গতিতে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই জন্যই আমাদের চিত্রপটে অশ্বের আসমানী ও হরিদ্বর্ণ, প্রকৃতির অনুকরণ না হইয়াও, বেশ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। এবং জনতার মুখমণ্ডল বিচিত্র বর্ণাভাসে আনুপূর্ব্বিক স্বভাবানুযায়ী না হইয়াই সমধিক শোভা পাইয়াছে। প্রাচ্য চিত্রকর সমস্ত পটটির উপরে যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল রমণীয় আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই চিত্রখানি মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, এই আলোকসন্নিবেশের উপরে বর্ণসঙ্গমের স্ফূর্ত্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এবং অনেক সময় এই আলোকবিক্ষেপের হেরফেরে কোথাও কৃত্রিমতাও সুশোভন হইয়া উঠে, কোথাও স্বাভাবিকতাও নেত্রপীড়া উৎপাদন করে।

এই প্রয়োগবিজ্ঞানে অমোঘ পটুত্বই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর প্রধান গৌরব। এমন কি, এই অশিক্ষিতপটুত্বে শিক্ষিত পাশ্চাত্য রুচি যেখানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে সেখানেই তাহার বর্ব্বর স্পর্শে শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অশিল্পী বর্ব্বরেরা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব্দ ও তাহার আভিধানিক অর্থ শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণা বালকেরও অধম। তাহারা গালিচার কৃত্রিম পুষ্পকে সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহে এবং আমাদের চিরন্তন শালের পাড়ে নেত্রঝলসা বর্ণে বিলাতী আদর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্যাটার্ণ সূচিত করিবার প্রয়াস পায়। ফলে, প্যাটার্ণ যতই স্বভাবানুরূপ হইয়া আসে, শিল্পের মনোহারিতা ততই দূর হইতে থাকে।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে কারণে গালিচার জমিতে ও শালের সূচিকার্য্যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি নিষ্ফল হয়, ঠিক সেই কারণেই আমাদের চিত্রশিল্পে নব্যতন্ত্রের স্বাভাবিকতা স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে না। গৃহভিত্তিমূলে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, ক্ষুদ্র গৃহাকাশের প্রস্তরনিবদ্ধ চতুষ্পার্শ্বে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠনপ্রণালী ও সহস্র কারুকার্য্যের সহিত তাহার সঙ্গতি সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই সঙ্গতিরক্ষার্থেই খুঁটিনাটির প্রতি দেশীয় চিত্রকরের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ। গৃহের প্রাচীরবেষ্টনমধ্যে কি রেখাবর্ণসমাবেশ সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন হয় আমাদের শিল্পীরা তাহার মর্ম্মটুকু আশ্চর্য্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি, আমাদের চিত্রকলা স্থাপত্যের একটি প্রধান অনুরঞ্জনী অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

নব্য পাশ্চাত্য চিত্রলেখার প্রণালীই কিছু স্বতন্ত্র। শিল্পী সেখানে যে উচ্চভূমিপরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দৃশ্যপটে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করেন তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বৃহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্র-ভাবে ভালরূপ চোখে পড়ে। এই জন্য, ঐ সকল ছবি দেখিতে গেলেও একটু তফাতে দাঁড়াইতে হয়, যাহাতে খুঁটিনাটি দৃষ্টি-পথে না পড়িয়া সমস্ত চিত্রখানি এক দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা সচরাচর যে ভাবে দেয়ালে ছবি টাঙ্গাইয়া গৃহকে সজ্জিত করি, তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য যে সম্যক্ বিকশিত হইবার অব-সর পায় এমন বোধ হয় না। তাহার দূরানুসূচিতা অনেক সময় গৃহভিত্তির চতুঃসীমামধ্যে প্রতিহত হইতে থাকে এবং বাহিরের মুক্তাকাশের ছায়ালোকও বোধ করি বদ্ধ গৃহে কথঞ্চিৎ অসঙ্গত হইয়া উঠে।

আমাদের চিত্রশিল্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণসঙ্গম মাত্র এবং নিকটে কারুকার্য্যে চিত্তহারী। গৃহের মধ্যে লোকে অনেক সময় কাছে আসিয়া দেখিবে ইহা আশা করাই যায়। সুতরাং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের এখানে বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এ কারুকার্য্য কেবলই জ্যামিতিক রেখাবিন্যাস মাত্র নহে, এবং বারা-ণসী শাড়ী বা কাশ্মীরী শালের সূচিকার্য্যের সহিত কলাগত ঐক্য বা সাদৃশ্য থাকিলেও নরনারীর বিচিত্র মুখভঙ্গী ও হাবভাবে ইহাতে যে একটি সরস সজীবতা সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা কিছু-তেই উপেক্ষণীয় নহে।

এবং ভারতবর্ষীয় চিত্রকরের রচনা এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার্হ। সভামধ্যেই কি, অন্তঃপুরেই কি, উৎসবেই কি, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার রচিত চরিত্রগুলির মুখে চক্ষে ভাবে ভঙ্গীতে একটু বিশেষ রকম আছে।—আমাদের আলোচ্য চিত্রা-বলীমধ্যে বিবাহযাত্রার পরেই একখানি অন্তঃপুরের চিত্র আছে—

রাজার অন্তঃপুর যেরূপ হইতে হয়, আগ্রার বাদ্‌শাহী বেগমমহ-লের অনুরূপ বিচিত্র কারুচিত্রিত শুভ্র মর্ম্মরহর্ম্ম্য এবং সুদীর্ঘ প্রাচীর নীরন্ধ্র হিমমর্ম্মর শুভ্রতায় চিত্রপটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি প্রসারিত। এই অন্তঃপুরকক্ষদ্বারে কিংখাবের সুবর্ণপুষ্পিত পর্দ্দার বাহিরে ঈষৎ ধূমায়িত ফলসাহী জমির উপরে স্বর্ণরেণুসিঞ্চিত বিচিত্রবেশী সপ্তরমণী ও সুগঠনা শ্যামাঙ্গী বীণা-বাদিনীর চিত্র। সকলেরই একটু ছল ছল ভাব, এবং বীণাবাদিনী সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়াছেন। তাঁহার ঘনপল্লবিত আবেশময় টানা চোখে একটি প্রশান্ত বিষাদানম্র স্থৈর্য্য এবং তনু অধর রেখাপাতে একটুকু সসম্ভ্রম দৃঢ়তা। বেশভূষার বিশেষ আতিশয্য বড় নাই, অথচ বেশ একটু পারিপাট্য আছে। সোনালী রঙের ঘাগরার উপর গোলাপী উত্তরীয়খানি স্তনপরি-সরটুকু মাত্র আচ্ছাদন করিয়া দুই স্কন্ধদেশ হইতে পশ্চাদ্দেশে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, কর্ণে দুইটি মরকতমণির দুল, কণ্ঠে সাতনলীর মত মতির মালা, বাহুতে তাবিজ, প্রকোষ্ঠে কনক কঙ্কণ, এবং কটিদেশে প্রাচ্য কবিদিগের চিরপ্রিয় মেখলা নাভি-নিম্ন হইতে দুইখানি চন্দ্রকলার মত নামিয়া আসিয়া মধ্য-ভাগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। একটি অল্পবয়স্কা বালা কর-যোড়ে বীণাবাদিনীর নিকট কি মিনতি করিতেছে। সবশুদ্ধ, দৃশ্যটিতে বিষাদে বিলাসে, কঠিন মর্ম্মর দেয়ালে ও মানবমুখের করুণ মিনতিতে এমন একটি সুন্দর মোহ সঞ্চারিত হইয়া উঠি-য়াছে! এই কয়টি নারীসমাগমের রহস্যে আমাদের সমস্ত মন একান্ত পরিপ্লুত হইয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধি ইহার অন্তস্তল অবধি পঁহুছে না। শুধু মনের মধ্যে কেমন একটি অনুরণন থাকিয়া যায়।

অন্তঃপুরের আর একখানি চিত্রে চিত্রকর আর একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া তুলিয়াছেন। তরুণী তন্বঙ্গী সুবর্ণ পালঙ্কে উপাধানবিন্যস্ত বামকরতলে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধালসাবেশে সর্ব্বাঙ্গ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন; নিম্ন অঙ্গে জরীর ফুলকাটা রক্ত-বর্ণ চীনাংশুকের পায়জামা, এবং উত্তরাঙ্গে একখানি লঘু সূক্ষ্মাম্বর ঈষন্নালিমমুখ আতুঙ্গ লাবণ্যরাশি সমুদ্ভাসিত করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। শিয়রদেশে সুন্দরী পরী পক্ষ উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন এবং পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনটি পরী পরিচারিকা—বেশভূষা কতকটা পুরুষেরই মত, আস্মানা, অলক্তক ও সবুজ রঙের চাপকান এবং তদুপরি সোনালী পাড়ের শুভ্র, ম্লানস্বর্ণ ও রক্তবর্ণের তিনটি কটিবন্ধ। ঘরদুয়ারগুলি পরি-পাটি পরিচ্ছন্ন—কোথাও আগ্রার সুন্দর জালিকাজ, কোথাও মর্ম্মর প্রস্তরের সুগঠিত স্তম্ভ, কপাটে মৈনপুরী তারকষির সোনালী কারুকার্য্য, হর্ম্ম্যতলে অতি সূক্ষ্ম নীল ও অলক্তকরাগের পুষ্পখচিত শুভ্র গালিচা। অনতিদূরে পশ্চাতে একটি নিবিড় উদ্যানের ঘন-পল্লবিত তরুশিরশ্রেণী দেখা যায়, এবং সম্মুখে রজতমুকুলিত চারু পুষ্পবাটিকা। সকলই এখানে কিন্তু যেন কেমন লঘু ও মায়া-ময়। এই কঠিন পাষাণবক্ষও মনে হয় যেন আরব্যোপন্যাসের একরাত্রির বিলাসকাহিনী মাত্র।

কিন্তু এ কি! আবার সেই বীণাবাদিনী—মৃদু চন্দ্রালোকে এক নিবিড় বনান্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি সমাসীন হইয়া অনন্যমনে বীণা বাজাইতেছেন, সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া এক সুসজ্জিত পুরুষ, দুই অলৌকিক পক্ষে তাহার অমানুষ বংশ নির্দ্দেশ করি তেছে এবং স্বর্ণ মুকুটে পদমর্য্যাদাও যে সূচিত না করিতেছে এমন বলা যায় না। দূরে বৃক্ষান্তরালান্ধকারে চারিটি লাঙ্গুলী

বিকটমূর্ত্তি একটি সুবর্ণ আসন নামাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।—এই দলপতি এবং দলবলকে আমরা বহুপূর্ব্বে, আমাদের চিত্রা বলীর সর্ব্বপ্রথম পৃষ্ঠায়, এক পার্ব্বত্য উপত্যকাভূমিতে ছাড়িয় আসিয়াছি। এই সুসজ্জিত পুরুষবর সেদিন ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণ সিংহাসনে বসিযা দৈত্যদিগকে কি আদেশ সংবিধানার্থে দক্ষি তর্জ্জনী নির্দ্দেশপূর্ব্বক শাসন করিতেছিলেন, এবং পর্ব্বতের উপরি দেশে একটি বৃহল্লাঙ্গুল দৈত্য বৃহৎ চুপড়ির মধ্য হইতে একা তরুণ মানবককে বাহির করিয়া বহিয়া আনিতেছিল।—তাহা পর কত দিন গিয়াছে—নূতন নূতন চিত্রে নব নব দিনের ঘটনা কোথাও শাহেনশাহ বাদ্‌শাহ মন্ত্রিবর্গপরিবৃত হইয়া দরবারগৃহে সমাসীন—খাতাপত্র লইযা মুন্সীর দল বসিয়া গিয়াছে এবং চামর ধারী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া স্বর্ণচামর ব্যজন করিতেছে; অন্য আমদরবারের মুক্তাঝালরখচিত চন্দ্রাতপতলে বৈদেশিক রাজদূ কুর্ণিশান্তে বাদ্‌শাহ সমীপে এক ছড়া মহামূল্য রত্নহার নজ নিবেদন করিতেছে; কোথাও তরুণ রাজকুমার কোন্ রাজ কন্যার উদ্দেশে সদলবলে যাত্রা করিয়াছেন—সে যাত্রাদৃশ্য কা স্বরীর রাজপুত্রের পাঠসমাপনান্তে গৃহাগমন বর্ণনা স্মরণ কর ইয়া দেয়; অন্যত্র সেই অশ্রুচ্ছলছল সপ্ত নারী ও চূড়ানিবদ্ধকো পাশ বীণাবাদিনী; চিত্রান্তরে অশ্রুসজল তরুণ রাজা এবং লেখ হস্তে চিন্তান্বিত বৃদ্ধ মন্ত্রী; ক্রমে সেই পরীসমাগত অন্তঃপুরকক্ষ সেই শুভ্র সুন্দর মায়াপুরী; তাহার পর নূতন দৃশ্যে আবার সে বীণাবাদিনী, সেই সুপক্ষ পুরুষবর, সেই লাঙ্গুলী দৈত্যদল। মন হয়, যেন সকলগুলির মধ্যে কোথায় একটি অন্তঃপ্রবাহিত যো সূত্র আছে, যেন এই সমস্ত লোকজন দৃশ্য সমস্তটি মিলিয়া এ খানি মহানাটকের উপসংহার ঘনাইয়া আনিতেছে। কিন্তু

জ্ঞানে, কিছুই ধরা দেয় না, শুধু সংশয় এবং অনুমান, চিন্তা এবং কল্পনা, রহস্য হইতে রহস্যান্তরে নিয়ত অবগাহন।

কিন্তু এ উৎসব কিসের? কিংখাবের বরশয্যোপরি রাজকুমার উপবিষ্ট, বামপার্শ্বে সেই মুকুটধারী দৈত্যপতি, গালিচার উপরে শ্রেণীবদ্ধ সভাসদ্‌গণ আসীন, এবং সম্মুখে বিচিত্র ভঙ্গীসহকারে নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। চিত্রকর এই দৃশ্যপটে নর্ত্তকীর পশ্চাদ্বর্ত্তী সারেঙ্গী ও তব্‌লাওয়ালার যে মুখভঙ্গীটুকু চিত্রিত করিয়াছেন কেবল ঐটুকুতেই তাঁহার নিপুণ রসগ্রাহিতা আশ্চর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর প্রত্যেকের মুখে তিনি এমন এক একটি স্বাভাবিক সহজ অথচ স্বতন্ত্র ভাব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, এই দশাঙ্গুলিপরিমিত স্থান মধ্যে দর্শকের চিত্ত বহুক্ষণ যাপন করিয়াও কিছুমাত্র ক্লিষ্ট হয় না।

চন্দ্রাতপের উপরে একটি পারসী বয়েৎ লেখা। চিত্রখানি এই লিপিরই অনুরঞ্জনী। ইংরাজি লিপিরঞ্জনী চিত্রকলার সহিত যাঁহারা পরিচিত, ইহার রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বলিবার বিশেষ কিছু নাই; কেবল, ভারতবর্ষীয় চিত্রকরের বর্ণ সমাবেশনৈপুণ্যে ও পারসী অক্ষরের সহজ শোভায় ইহা সমধিক চিত্তহারী হইয়া উঠিয়াছে। এত বিচিত্র সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাস, এত অসংখ্য রঙের সমাবেশ ও তাহার এরূপ মনোহর সামঞ্জস্যসাধন অন্যত্র এরূপ সুলভ নহে। বিলাতী লিপিরঞ্জনে অনেক স্থলে কেবল লাল এবং নীলেরই প্রাচুর্য্য এবং তাহার উপর স্বর্ণরেণু-সিঞ্চিত কারুকার্য্য, কিন্তু রেখায় রেখায় এরূপ নব নব বর্ণ এবং আভার অপূর্ব্ব মেলন সেখানে অতি বিরল দৃশ্য। এখানে গালিচার পাড়ে, বরাসনের কারুকার্য্যে, সম্মুখের দীপাধানের ডালে ডালে, এমন কি, প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকাশিখামুখে পর্য্যন্ত রঙের কারু-

কার্য্য অতি বিচিত্র। এবং লাল নীল সোনালী বেগুণী আস্মানী ফলসাই গোলাপী ক্ষীরী আল্তাই ধূপছায়া ধূসর কপিশ সকল বর্ণেরই এখানে প্রাচুর্ভাব, দুর্লভ কেবল রাণীগঞ্জের কৃষ্ণতমিস্র অঞ্জনগঞ্জনা। এই এতগুলি চিত্রের পর গুটিকতক পারসী অক্ষর ব্যতীত কালো রঙের বড় কিছু ত মনে পাড়তেছে না; এব তাহাও শ্বেত ও সোনালী চতুঃসীমার মধ্যে উজ্জ্বল হইয়াই উঠিয়াছে বৈ অন্ধকার গাঢ় করে নাই।

কিন্তু স্থান সঙ্কীর্ণ এবং পাঠকগণেব ধৈর্য্যেরও সীমা নিরবধি নহে; ইহার উপরে, চিত্রের যে সৌন্দর্য্য তাহা আমার এই জড় ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব; সুতরাং সুদীর্ঘ বর্ণনায় ছেদ দিবার যথেষ্ট সময় হইয়াছে।—এখনও দৃশ্য অনেকগুলি। অন্তঃপুরের উদ্যানবটিকায় যোড়শী তরুণী বহু সখীসমাগমের মধ্যে বীণাবাদিনীর আবার আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে বীণা নাই, শুধু একটি সস্মিত সেলামে সমাগত যুবতিবৃন্দকে তিনি সাদর অভিবাদন জানাইতেছেন এবং তরুণীরা থালে থালে ভারে ভারে বহু উপঢৌকন লইয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিতেছেন।—আবার রাজসভা, নজর নিবেদন; বৃক্ষবাটিকায় পরিচারিকা ও সখীসহ বিষাদানতমুখ রাজ-অন্তঃপুরিকার নিভৃত অবস্থান; পরদুঃখে বাষ্পগদগদ রাজা রাণী এবং বীণাবাদিনী ও দৈত্যপতি; সহস্র ধারাযন্ত্রনিঃসৃত জলকণাস্নিগ্ধ বেগমমহলের লাস্যময়ী বিলাসকলা; রক্তবস্ত্রের আচ্ছাদনতলে তরুণবয়স বরকন্যার প্রথম শুভদৃষ্টি-বিনিময়; বধূসহ রাজপুত্রের মাতৃসমক্ষে আগমন; আবার সেই বীণাবাদিনী ও দৈত্যপতি সমাগম—শুভ্র মর্ম্মরহর্ম্ম্যতলে বীণাখানি একপার্শ্বে পড়িয়া আছে এবং সুবর্ণ থালের উপরে স্ফাটিক পানপাত্র ও সরকভাণ্ড সুসজ্জিত, পানভূমির সিন্দূররক্ত অনতিউচ্চ

জালিকাটা প্রাচীরবাহিরে দৈত্য দানবের দল মনের উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। তাহার পর মহোৎসবের মত্ততায় ও প্রিয়-সমাগমের পরমোৎসাহে দিল্লীর এই প্রাচীন চিত্রাবলীর উপসংহার। এবং যবনিকা পতনের পর সমগ্র নাট্যখানি মনের মধ্যে যেরূপ দৃশ্যে আলোকে রূপে গীতে সৌন্দর্য্যে শৃঙ্গারে বর্ণে অভিনয়ে ঘনাইয়া আসিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এই চিত্রকলাও সেইরূপ আমাদের মন-অন্তঃপুরে তাহার ভাবে ভঙ্গীতে বর্ণে লাবণ্যে মুখশ্রী ও গঠনপারিপাট্যের সমাবেশে একটি সুন্দর মায়ালোক-মোহে রমণীয় হইয়া আসে। মনে হয় যেন পুরাতন ভারতবর্ষের কোন্ কলাভবনপ্রদর্শনী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, যেখানে কালিদাসের কাব্য, কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, দিল্লী-অন্তঃপুরের প্রসাধন-বিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, কটকী রূপার কাজ, দক্ষিণের চন্দনখোদাই শিল্প এই সমস্ত একত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সকলগুলির মধ্য হইতে ভারতবর্ষের কারুকুশলা প্রতিভা বিকশিত হইয়া কোথায় একটি মনোহর ঐক্য সূচিত করিতেছে। এই ঐক্যসূত্রেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা চির-সজীব এবং ইহাতেই আমাদের পুরাতন কলাভবন এত চিত্তহারী।

শুনঃশেপের বিলাপ।

বিশ্বদেবতাগণ যে সময় প্রবুদ্ধ হইয়া যজমানের যাগ গ্রহণার্থ উদ্যুক্ত হইতেন, অধুনা সেই সময় প্রবুদ্ধা এক উবর্বুধা মর্ত্ত্যনারী প্রতিদিন ঋক্‌মন্ত্র অধ্যয়নে নিযুক্তা হয়। তাহার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে

কোন দিন উষোদয়েরও পূর্ব্বে, মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকারে, দস্র ও নাসত্য অশ্বিদ্বয় স্ব স্ব রথ পরিচালনা করেন। তাহারই নয়নাগ্রে ইন্দ্রদেব প্রতিদিন নিদ্রায় সংজ্ঞারহিত বিশ্বকে সংজ্ঞাদান করেন, অন্ধকারে রূপরহিত বিশ্বকে রূপদান করেন। তাহারই ঋক্-মন্ত্রদীপ্ত কল্পনা উদ্ভাসিত করিয়া দ্বাদশ আদিত্য একে একে আকাশে সমুদিত হন ও দুর্দ্ধর্ষ মরুৎগণ সমুদ্রবারি উৎক্ষিপ্ত করেন।

প্রতিদিন এইরূপ হয়। অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, ভূলোক ব্যাপ্ত করিয়া দেবতাগণই বিরাজ করেন। প্রাতর্গগন, মাধ্যন্দিন গগন ও নৈশগগন সকলই তাঁহাদের স্তুতিগানে পরিপূরিত রহে। তাঁহারা কখন যজ্ঞশালায় উপনীত হইয়া মধুর হব্য ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত অভিষুত দধিমিশ্রিত সোমরস পান করেন ও যজ্ঞানুষ্ঠাতা হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া প্রভূত ধনরত্ন দান করেন। কখন বা সুখতম রথে মনোযুজা অশ্ব সংযোজন করিয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন। স্থলে দেবতা, জলে দেবতা, নভোমণ্ডলে দেবতা—ত্রিভুবন দেবতাত্মক। সেই বহুদেবতার বহুশোভন কণ্ঠে বিলুপ্ত চেতনায় বিনিদ্রা নারী প্রতি উষা যাপন করে।

কিন্তু তাহার শ্রবণকুহরে আজি এ কোন্ মানবকণ্ঠ সহসা অভিঘাত করিল? কোন্ আর্ত্ত মর্ত্ত্যের বিলাপ বরেণ্য দেবগণের ধ্যান হইতে তাহার চিত্তবিক্ষেপ করিল?

"কস্য নূনং কতমস্যামৃতাণাং মনামহে চারু দেবস্য নাম
কোনো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরঞ্চ দৃশেয়ং মাতরঞ্চ॥"

"দেবগণের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কোন্ দেবের চারুনাম উচ্চারণ করিব? কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন যে আমি পিতা ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি?"

একি সকলি অলীক! কেবলই কবিকল্পনা! স্বর্গ ও মর্ত্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সেদিনও ছিল না? দেবতাগণ সত্যই মর্ত্ত্যবাসীর প্রত্যক্ষগোচরে চরাচরে বিহার করিতেন না?—একি সন্দেহ! একি ক্রন্দন! "কোন্ শ্রেণীর কোন্ দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব, কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন?" দেবলীলানিমগ্নার, অমৃত-লোকান্তরিতার একি বেদনাময় প্রত্যক্ষ জগতের পুনস্তপ্ত সংস্পর্শ!

হায় অতীত মর্ত্ত্যবালক শুনঃশেপ! যে দেবতাগণ তোমার পূর্ব্বতন ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন এবং যাঁহারা উত্তর ঋষিগণেরও স্তুতিভাজন, যাঁহাদের প্রদত্ত অন্নে তোমার ঋষিবালকদেহ এতকাল পরিপুষ্ট, যাঁহাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে তোমার ঋষিবালকাত্মা এতকাল পরিদৃষ্ট, আজ আসন্ন বিপৎকালে তাঁহারা তোমার চিত্ত হইতে ব্যবহিত? আজ তাঁহাদের প্রতি ভক্তি বিচলিত? আজ সন্দিগ্ধ চিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেছ—"কোন্ শ্রেণীর কোন্ দেবের চারুনাম উচ্চারণ করিবে? কে তোমাকে এই মহতী পৃথিবীতে আবার ছাড়িয়া দিবেন?"

দেবতা বহু, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্, ইন্দ্র বৃষ্টিপ্রদ, সূর্য্য আলোকবর্ষী, বরুণ অর্ণবপতি, পৃথিবী অন্নদাত্রী ও জীবের নিবাসভূতা। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন ফলদাতা—ইহা সকলেরই পরিজ্ঞাত; তথাপি আনন্দের, কৃতজ্ঞতার, ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রত্যেক দেবতার স্তবকালে তাঁহাকেই সর্ব্বফলদাতারূপে অভিহিত করা হয়। সম্পদের দিনে এ অতিশয়োক্তিতে কাহারও কার্পণ্য হয় না। কিন্তু বিপদের দিনে, আসন্ন মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের সঙ্কট মুহূর্ত্তে তাহা হইতে মন বিরত হয়, এবং ব্যাকুলভাবে অন্বেষণ করে

"কে সে সর্ব্বশক্তিমান্, আজি যে দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব?"

যজ্ঞবলিরূপে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ বালকের পাশোন্মোচন করিতে সমর্থ কোন্ পঞ্চভূতাত্মক দেব? পিতাকর্ত্তৃক যে শতগাভীর বিনিময়ে বিক্রীত হইয়াছে, প্রবল প্রতাপ রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণমণ্ডলী কর্ত্তৃক যে সত্য সত্যই পশুর ন্যায় বলিদানের নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়াছে, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলে যাহার বিরুদ্ধে শস্ত্রহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত ক্ষিত্যপ্‌তেজ বা মরুৎ ব্যোম কি করিতে সমর্থ?

শুনঃশেপের ক্রন্দনে ঋক্ জগতের মায়াযবনিকা মুহূর্ত্তের জন্য অপসারিত হয় এবং নিরাভরণ সত্য পলকে আত্মপ্রকাশ করে।

হোমাগ্নি, সোমলতা, স্তোম ও উক্থের দিবসে পঞ্চক্ষিতিবাহিনী সরস্বতীতটে যে বন্ধনাসহিষ্ণু শিশু মহতী পৃথিবীতে পুনর্ব্বার মুক্তিসুখলালসায় ব্যাকুল হইয়াছিল, যে অসামান্য বালক উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতক্রন্দনে সেদিনকার দিগন্ত ধ্বনিত করিয়াছিল, মানবিকতায় অতুলনীয় তাহার কাহিনী যেন কবিত্বে বিধাতার অপূর্ব্বতম রচনা।

স্মরণ কর মানব-ইতিহাসের প্রত্যূষে প্রথমার্য্যগণ যখন উত্তরকুরু অতিক্রম করিয়া ভারতখণ্ডে উপনীত হন। কঠিনা ধরিত্রী, ঊষরা পার্ব্বত্যভূমি, বৃষ্টিবিরল, অপ্রচুর শস্য, শত্রুপরিবৃত বনাকীর্ণ প্রদেশ। মুষ্টিমেয় গোধূম ও স্বল্প গোদুগ্ধেই সেদিনকার জীবযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, অথচ তাহাও সকলের পক্ষে সুলভ নহে। ঋক্‌দ্রষ্টা প্রত্যেক ঋষিই গাহিতেছেন "হে সুক্রতু! হে শতক্রতু! আমাকে অন্নদান কর, আমাকে গাভী দান কর, আমাকে ধন দান কর।" সেই বিরলান্নের দিনে গহন অরণ্যে অনশনপীড়িত

মৃতপ্রায় কোন আর্য্যদম্পতী পড়িয়া রহিয়াছে। অনাহার-ক্লেশ আজও যেমন দুর্ব্বহ, সেদিনও তেমনি ছিল। শুধু জায়াপতি অভুক্ত নহে, তাহাদের তিনটি সন্তান রহিয়াছে, তাহাদেরও প্রতিদিন ক্লিষ্ট দেখিতে হইতেছে। হয়ত দিনের পর দিন গিয়াছে, ঋগ্বেদের অগণিত দেবগণ তাহাদের প্রতি সমনির্ম্মম রহিয়াছেন, তাহাদের কষ্টে দৃক্‌পাত করেন নাই, তাহাদের প্রার্থনায় চির-বধিরতা অবলম্বন করিয়াছেন। আজ সেই অরণ্যে সহসা রাজপুত্র রোহিতের আবির্ভাব ও শত গাভীর বিনিময়ে বরুণ-দেবকে একটি পুত্রপ্রদানের প্রলোভন প্রদর্শন! অন্নাভাবে যাহারা প্রতিদিন তিল তিল মৃত্যু উপভোগ করিতেছে তাহাদের পক্ষে সামান্য প্রলোভন নহে!

কিন্তু এই অনাদিকালের সত্যকাহিনীর—জগৎস্রষ্টার স্বরচিত সাহিত্য কথার অবয়বে যদি দেখিতাম শুনঃশেপ ঋষিদম্পতীর একমাত্র সন্তান এবং তাঁহারা আত্মপ্রাণধারণার্থ পুত্রপ্রাণ দান করিলেন, তবে কারুণ্য তাহাতেও থাকিলেও বুঝি রসবত্তা সম্পূর্ণ হইত না, কারণ অসাধারণ্য ঘটিত না। অন্নকষ্টের সঙ্কট সময়ে স্নেহবৃত্তির বিকৃতির দৃষ্টান্ত সাধারণ! কিন্তু ততোধিক অসাধারণ যে চরিত্র-ব্যভিচার তাহারই দ্বারা শুনঃশেপ আখ্যান কারুণ্যরস-ভূয়ান্।

অর্থলোলুপ বন্যঋষি একেবারে সন্তানস্নেহবর্জ্জিত নহে; তাহার যতটুকু স্নেহের ভাণ্ডার তাহার সমস্তই জ্যেষ্ঠপুত্রে সমর্পিত হই-য়াছিল। রোহিত যখন তাহাকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন—শতগাভীর প্রলোভন সত্ত্বেও ঋষি বলিল "ইহাকে নহে।" রোহিত তখন কনিষ্ঠ পুত্রকে গ্রহণোদ্যত হইলেন। এই বন্য ঋষির অভুক্তা বন্যপত্নী, শুনঃশেপের অপ্রাকৃতা ক্রূর মাতা—

এতক্ষণ অন্ন বিনিময়ে সন্তান বিক্রয়ের প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করে নাই, কিন্তু যখন কোলের পুত্রটিকে লইয়া রোহিত চলিয়া যান দেখিল, তখন তাহারও মাতৃহৃদয়ে বেদনা বাজিল—সে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "ইহাকে নহে।" অনন্যোপায় হইয়া রোহিত মধ্যম পুত্রের হস্তধারণ করিলেন, কেহ নিবারণ করিল না, জায়াপতি মৌন রহিল। রোহিত রুদ্যমান্ বালক শুনঃশেপকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

অর্থলোভ কোনস্থলে সন্তানবাৎসল্যের নিকট পরাভূত হইয়াছে, কোনস্থলে তাহাকে পরাভব করিয়াছে—তাই শৌনঃশেপ-ইতিহাস মানবিকতায় এতদূর আর্দ্র। হায়! পিতারও পরম স্নেহিত নহে, মাতারও নহে, তবু সে অবোধ বালক কাঁদিতেছে "পিতরঞ্চ দৃশেয়ং মাতরঞ্চ!" কোথায় অযোধ্যার নিষ্ঠুর রাজসূয় যজ্ঞসভা, কোথায় অরণ্যগহনে মাতার ঈপ্সিত, কল্পিত স্নেহ-ক্রোড়!

কিন্তু সহসা একি রসধারায় যজ্ঞস্থল প্লাবিত হইল? এই অসহায় বালক ব্রহ্মা, হোতা, অধ্বর্য্যু উদ্গাতাপ্রমুখ সমগ্র ঋষিমণ্ডলীকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়া এ-কি রাগ একি ছন্দে যজ্ঞাকাশ কম্পিত করিল? আশ্চর্য্য! নিবিড় অরণ্যে অদ্ধাশনে এ কোন্ বালক কবি বিচরণ করিতেছিল? যখন তাহার ভ্রাতারা অনাহারক্লেশে অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকিত, এ কোন্ সুধারসপানে সঞ্জীবিত থাকিয়া অনিমিষ-বিচারী জল ও বায়ুর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিত, বনস্পতি ও ওষধিগণের সহিত সখ্য করিত, নিশীথকালে দীপ্যমান্ সপ্তর্ষি নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের দিবাযোগে অন্তর্ধান রহস্য কল্পনায় বিহ্বল হইত?

সেদিনকার বৈদিক জগৎ বিমোহিত করিয়া ও দেবগণের মনোহরণ করিয়া বালক স্বরচিত নূতন গায়ত্রীচ্ছন্দে গাহিল

"ত্বং বিশ্বস্য মেধির দিবশ্চগ্মশ্চ রাজসি।
সযামনি প্রতিশ্রুধি॥

হে মেধাবী বরুণ! তুমি দ্যুলোক ও ভূলোক ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান্ রহিয়াছ, আমার ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণানন্তর উত্তর দান কর॥

উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বিপাশম্ মধ্যমং চৃত।
অবাধমানি জীবসে॥

আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া দাও, নীচের পাশ খুলিয়া দাও, যেন আমি জীবিত থাকি।

ইমং সে বরুণ শ্রুধী হব মদ্যাচ মৃড়য়।
ত্বামবস্যু রাচকে॥

হে বরুণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, অদ্য আমাকে সুখী কর, তোমার রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি ডাকিতেছি।"

এবং পরম উচ্ছ্বাসে, পরম বিশ্বাসে পরম হর্ষে উচ্চারণ করিল

"দর্শম্ নু বিশ্বদর্শতম্ রথমধিক্ষমি।
এতাজুষত মে গিরঃ॥

সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দৃষ্টি করিয়াছি, ভূমিতে তাঁহার রথ বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি; আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।"

সত্যই বরুণদেবের রথ করুণারূপে ভূমিতে অবতীর্ণ হইল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় বিগলিত হইল, এবং বালকের পাশোন্মোচন হইল।

কিন্তু শুনঃশেপ কাহিনী এখনও পরিসমাপ্ত হয় নাই। তাহার অসাধারণত্ব নিঃশেষিত হয় নাই। এ বালক শুধু ঋক্‌দ্রষ্টা নহে! ইহার উদ্ভাবনী প্রতিভা অবিলম্বে এক সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রে বিক-

শিত হইল। পাশোন্মুক্ত ঋষিবালক অন্যান্য পুরোহিতগণের সহিত সেই যজ্ঞেই আসনলাভ করিয়া, বৃদ্ধ ঋষিগণকে চমৎকৃত করিয়া অঞ্জঃসব নামে এক নূতন আসব আবিষ্কার করিল উলূখলদ্বারা অভিষুত সেই নূতন সোমাসব গ্রহণার্থ ইন্দ্রকে সুন্দর ঋকে আমন্ত্রণ করিল; এবং আনন্দপরবশে উলূখলকে সম্বোধন করিয়া বলিল "হে উলূখল যদিও তুমি গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হও তথাপি এই যজ্ঞে তুমি বিজয়ীদিগের দুন্দুভির ন্যায় প্রভূত ধ্বনি-যুক্ত শব্দ কর; প্রৌঢ় ধ্বনির সহিত পুনঃ পুনঃ বিহার কর, দর্শনীয় অভিষব যন্ত্রদ্বারা মধুর সোমরস প্রস্তুত কর।"

রে মূঢ় অজীগর্ত্ত! কাহাকে অবহেলে দান করিয়াছিলে এবং লোভান্ধ হইয়া কাহার বধার্থ স্বহস্তে শস্ত্রধারণ করিয়াছিলে!

ক্ষুৎপীড়িত ঋষি পুত্রবিনিময়ে প্রথম যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল তাহার মূলে লোভই একমাত্র নিমিত্তক ছিল না। তখন পুত্রস্নেহ পুত্রবিশেষ স্নেহের নিকটও অনেকাংশে পরাভূত হইয়াছিল বটে। কিন্তু এই আদিতম মানবকাহিনীতেও দেখিতেছি একবার ষড়রিপুর কোন রিপুকে অন্যান্য মনোবৃত্তির উপর প্রাধান্য দিলে সে প্রাধান্য প্রত্যাহরণ একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে; তাহার প্রতাপ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং কালক্রমে সে আর সকল বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। একবার লোভের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া অজীগর্ত্ত তাহাকে প্রায় চিরদাসত্বের সন্ধিপত্র লিখিয়া দিয়াছিল। ব্যাঘ্রের রুধির-স্পৃহার ন্যায় অজীগর্ত্তের অর্থস্পৃহা কিঞ্চিৎ আস্বাদনে শতগুণ বর্দ্ধিত ও সম্পূর্ণ অদম্য হইয়াছিল।

রোহিত কর্ত্তৃক শুনঃশেপ বলিস্বরূপ যজ্ঞস্থলে আনীত হইলেও কোন ঋষিই তাহাকে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু

অজীগর্ত্ত স্বয়ং আর এক শত গাভীর বিনিময়ে তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। পুনশ্চ, পাশবদ্ধ বালকের হন্তারক পাওয়া যখন দুর্ঘট হইল, লোভ সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব কোমলবৃত্তির উপর জয়ী হইল—অপর এক শত গাভীর প্রলোভনে পিতা স্বীয় পুত্রের প্রাণহননার্থ অস্ত্র গ্রহণেও কুণ্ঠিত হইল না।

দৈবানুগ্রহে এখন সেই বালক বিগতভয়, বিমুক্তপাশ কবি শুনঃশেপ নামে বিখ্যাত, রাজসূয় যজ্ঞসভার সকলের সম্মানিত—এখন পিতারও আদৃত। কিন্তু হায়! সে স্নেহশীল, অন্ধ, অবোধ বালক আর নাই; প্রথমকবির প্রথমনায়ক জীবনের প্রথম তাপে ক্লেশকর পরিণতি লাভ করিয়াছে; তাহার স্নেহ এখন কাঠিন্যে, অন্ধ ভক্তি এখন অন্ধ অবজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। যজ্ঞপূর্ব্বে যে কাঁদিয়াছিল "পিতরঞ্চ দৃশেয়ং মাতরঞ্চ," যজ্ঞাবসানে সে পিতার প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া বিপৎসুহৃদ্ মুনি বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। অনুতপ্ত পিতা তাহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আহ্বান করিল, তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুত্রকে শতগাভী দানে প্রতিশ্রুত হইল। বালক উচিত মন্যুভরে উত্তর করিল "শূদ্রও স্বীয় পুত্রবধার্থ অস্ত্র উদ্যত করে না, তুমি তাহাও করিয়াছ। তোমার নিকট আমা অপেক্ষা তিনশত গাভী অধিক মূল্যবান্ বিবেচিত হইয়াছে। এ প্রকার পাপ যে একবার করিতে পারে সে পুনর্ব্বারও করিতে পারে। এখনও তোমার মন হইতে শূদ্রোচিত নিষ্ঠুরভাব তিরোহিত হয় নাই, এখনও আমাকে শতগাভীর দ্বারা প্রলুব্ধ করিতেছ। তোমার সহিত পুনর্মিলন অসম্ভব!"

বৈদিক বালকের আচরণে সরল, স্বাভাবিক মানবিকতা ব্যক্ত

হইল, পরন্তুন নীতিবিদমুমোদিত অস্বাভাবিক, অসম্ভব, অমানুষিক মহত্ত্বের কোন ছায়া দৃষ্ট হইল না। যে পিতা হইয়াও অপিতৃজনোচিত ক্রূরাচরণ করিয়াছিল তাহাকে বালক পরিত্যাগ করিল, এবং যে পিতা না হইয়াও পিতৃজনোচিত স্নেহে তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল তাঁহারই পুত্রত্ব স্বীকার করিল।

অজীগর্ত্ত যে পুত্রকে বরুণদেবের উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিল, তাহাকে আর ফিরিয়া পাইল না, ভগ্নমনোরথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল; এবং বিশ্বামিত্র স্বীয় শতপুত্র সত্ত্বেও শুনঃশেপকে জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকার প্রদান করিয়া স্বীয় হৃদয়ে টানিয়া লইলেন।

আদি মানববংশের আদি চরিত্রদ্বন্দ্ব কাহিনী সমাপ্ত হইল। সমগ্র ঋক্‌সংহিতায় কেবলমাত্র সাতটী শৌনঃশেপ সূক্ত। তাহারই মধ্যে স্তরে স্তরে এত মানবিকতা নিহিত ছিল যে তাহার মায়াজালে ঋক্‌মন্ত্রের দৈবিকতা ক্ষণেক বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে ফিরাইয়া আনে, স্তুতিপ্রিয়া অমর ঊষা তদ্রূপ পরদিন, ঋগ্বেদের অর্ভক দেবগণ, তরুণ দেবগণ ও বৃদ্ধ দেবগণকে পুনর্ব্বার এই জাগ্রতা নারীর চেতনায় ফিরিয়া আনিলেন।

ঐতিহাসিক ম্যালিসন্।

His long service had given him conscious or unconscious bias in favour of the constituted authorities which led him to the indiscriminate whitewashing of

official reputations. The process materially robbed his work of the historian's first requisite—reliability. Still, no gallery of distinguished Anglo-Indians is complete that does not contain a portrait, albeit a miniature, of Malleson.—The Indian Statesman 6 March 1898.

কর্ণেল ম্যালিসনের মৃত্যু সংবাদে এদেশের ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ বহন করিতে গিয়া, কলিকাতার জনৈক ইংরাজ সংবাদপত্র-সম্পাদক তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর দোষোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করায়, আরও ব্যথিত হইবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে!

সম্পাদক মহাশয় বলেন,—"দীর্ঘকাল রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, ম্যালিসন্ ইংরাজ-রাজপুরুষবর্গের কার্য্যকলাপের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহাদের সুযশ-কীর্ত্তনের জন্য অনেক শাসনকলঙ্ক গোপন করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর গৌরব নষ্ট হইয়াছে,—ঐতিহাসিকের প্রধানগুণ বিশ্বাসযোগ্যতা, তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে!"

ম্যালিসন্ জীবিত থাকিতে কাহারও মুখে এমন কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। কি স্বদেশে কি বিদেশে সর্ব্বত্রই ম্যালিসনের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী সবিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে; কেহ কেহ বরং ইহাও বলিয়া থাকেন যে,—সাহস ও সত্যনিষ্ঠার সহিত লিপিকৌশল মিলিত হইয়াছিল বলিয়াই ম্যালিসনের গ্রন্থাবলী এতদূর উপাদেয় হইয়াছে।*

---

* ম্যালিসনের "সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস" সমালোচনায় টুপপত্র লিখিয়া-

ম্যালিসন্ ইংরাজ। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান যুগের ন্যায়নিষ্ঠ সত্যানুসন্ধাননিপুণ মহানুভব ইংরাজ বলিয়া ইংরাজ রাজত্বের আদিযুগ আলোচনা করিবার সময়ে অতিমাত্রায় স্বজাতি-বাৎসল্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করিতে হইলে, সংক্ষিপ্তভাবে তদীয় জীবন কাহিনীরও আলোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা শীতাবকাশ সময়ে দুই চারি সপ্তাহের জন্য ভারতভ্রমণে বহির্গত হইয়া খানকতক পুরাতন পুস্তক ও ফটোগ্রাফের সহায়তায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন, ম্যালিসন্ সে শ্রেণীর লেখক ছিলেন না।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে জর্জ ব্রুস্ ম্যালিসনের জন্ম হয়। বাল্যে উইঞ্চেষ্টারে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে যুবক জর্জ সামান্য সৈনিকরূপে বঙ্গীয় সেনাদলে প্রবেশ করিবার জন্য ভারতবর্ষে উপনীত হন। ভারতবর্ষে তখনও কোম্পানীর শাসন প্রচলিত ছিল; তখনও ইংরাজেরা ভারতবর্ষের স্বর্ণচূড় দেউলাভ্যন্তরে অগণিত ধনরত্ন প্রোথিত রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। রাতারাতি বড় মানুষ হইবার জন্য কত ইংরাজ আসিয়াছেন, কতজন সত্য সত্যই অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রভূত ধনরত্ন আহরণ করিয়া স্বদেশে জীবনসন্ধ্যায় প্রাচ্য নবাবের বিলাসবিভ্রমের অনুকরণ করিতে গিয়া ইংরাজ নরনারীর বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন; কত জন আবার জলবায়ুর প্রকোপে, শিক্ষাদীক্ষার অত্যাচারে, কুসংসর্গের প্রভাবে ভারতবর্ষেই অকালে জীর্ণকঙ্কাল বিসর্জ্জন

ছিলেন :—"A work as fearless in its criticism of men and warlike operations as it is remarkable for vigour and picturesqueness of style.——Truth.

করিতে বাধ্য হইয়াছেন! ম্যালিসন্ এরূপ দেশে এরূপ যুগে এরূপ সংসর্গের মধ্যে পতিত হইয়াও সহযোগিগণের কুহকজালে আবদ্ধ না হইয়া এদেশের ভাষা শিক্ষা ও বিবিধ জ্ঞানার্জ্জনে কায়-মনোবাক্যে নিযুক্ত হন। নগণ্য সৈনিক যুবক ম্যালিসনকে কেহ চিনিত না; তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অবসরসময়ে কেবল ভারতীয় ঐতিহাসিক তত্ত্বানুশীলন করিতেন।

এইরূপে দশ বৎসরেরও অধিক সময় কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে ম্যালিসনের জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন পদোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না।

কোম্পানী বাহাদুরের রাজ্য একরূপ ভালই চলিতেছিল; দেশের পর দেশ কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হইতেছিল,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বত্র "লালে লাল" হইয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে সহসা সিপাহী বিদ্রোহের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল! সিপাহী বিদ্রোহ ধীরে ধীরে প্রধূমিত হইবার সময়ে কোম্পানীর কর্ম্ম-চারিগণ তাহা নির্ব্বাণ করিবার আয়োজন করিলে হয়ত এতদূর সর্ব্বনাশ হইতে পারিত না। কিন্তু তাঁহারা বিদ্রোহের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা না করিয়া, সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন সমালোচনার কণ্ঠ-রোধ করিবার আয়োজন করিয়া, বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবার সহায়তা করিতে লাগিলেন। আজ দিল্লী গেল, কাল মিরাট গেল,—এইরূপে কোম্পানীর শাসনকৌশল ক্রমেই ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গের প্রতিহিংসাবৃত্তিও ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পিশাচের ন্যায় নৃত্য করিয়া বেড়া-ইতে লাগিল; ইংরাজ নরনারী বালক বালিকা ও মাতৃস্তনপানরত সদ্যোজাত শিশুসন্তান পর্য্যন্তও পরিত্রাণ পাইল না,—রাজ-

পুরুষদিগের যাহা কিছু ধৈর্য্যবল অবশিষ্ট ছিল, এই সকল কারণে তাহাও তিরোহিত হইয়া গেল! তখন ভারতসাম্রাজ্য টলমল করিয়া উঠিল; কোম্পানীর অধিকার যায়যায় হইয়া উঠিল; সর্ব্বত্র হাহাকার ধ্বনিত হইতে লাগিল! এই সময়ে ম্যালিসন্ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পদবিক্ষেপ করেন। *

সিপাহী বিদ্রোহের মূলানুসন্ধান করিয়া রাজপুরুষবর্গের শাসনকলঙ্ক প্রদর্শন করিবার জন্যই ম্যালিসন্ লেখনী ধারণ করেন। তাঁহার লিখিত রক্তাবরণমণ্ডিত বিদ্রোহকাহিনীর সুতীব্র সমালোচনা-পুস্তক ভারতে ও বিলাতে হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। পথে ঘাটে সভামণ্ডপে ও মন্ত্রাসমাজে সর্ব্বত্রই ম্যালিসনের পুস্তকের আলোচনা হইতে লাগিল; তাঁহার নিরপেক্ষ সমালোচনায় অনেকেরই জ্ঞানোদয় হইল, যথাকালে কোম্পানীর আমল উঠিয়া গিয়া ভারত রাজরাজেশ্বরীর সাক্ষাৎ শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইল। একখানিমাত্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াই ম্যালিসন যশস্বী হইয়া উঠিলেন। অনেকে তাঁহার অনিষ্টশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন; কোম্পানীর আমল উঠিয়া না গেলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু নূতন আমলে ম্যালিসনের উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইতে লাগিল। তিনি সৈনিক বিভাগের বিবিধ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উত্তরকালে মহীশূরের মহারাজকুমারের অভি

* ম্যালিসনের প্রথম পুস্তকের নাম The Red Pamphlet ইহা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্ত্তী পুস্তক সমালোচনার সময় Fortnightly Review পত্রে Malleson's Red pamphle সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—"It is pleasant to contrast th work now before us with the writer's first bold plung into historical composition, which splashed ever one within his reach.

ভাবক হইয়া অবশেষে বিশ্রামবৃত্তিসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এবার ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত শরীর সসম্ভ্রমে সমাধি নিহিত হইয়াছে!

ম্যালিসন্ দীর্ঘকাল রাজ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা সত্য কথা। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়েই "কলিকাতা রিভিউ" ও বিলাতের কোন কোন পত্রে তাঁহার প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তাহাও সত্য কথা। কিন্তু তিনি এই সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনা করিবার সময়ে জ্ঞাতসারে যে কাহারও কলঙ্কগোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

ম্যালিসনের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। তিনি ইংরাজরাজত্বের আদিযুগ ও তাঁহার সমসাময়িক সিপাহী বিদ্রোহের যুগ—এই উভয় যুগেরই অনেক ঐতিহাসিক রহস্য সংকলন করিয়া গিয়াছেন। সিপাহী যুদ্ধ সে দিনের ঘটনা, এখনও তাহার সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হয় নাই; তৎসম্বন্ধে ম্যালিসন্ যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহার সমালোচনার সময় উপস্থিত হয় নাই। ইংরাজ রাজত্বের আদিযুগের কথা এখন ইতিহাসের সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে; রাজপুরুষেরাও তৎসম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং অন্য লোকের স্বাধীন তত্ত্বানুসন্ধানের সহায়তা করিবার জন্য অনেক সরকারী কাগজপত্র ক্রমশঃ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতেছেন। সে যুগের কথা এখন পুরাতন হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহারা সে যুগের অভিনেতা তাঁহারা সকলেই বহু পূর্ব্বে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করায় এখন আর সত্যোদ্ঘাটনের বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। তৎসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে

ম্যালিসন্ কিরূপ মতামত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলেই তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়ানুরাগের পরিচয় প্রকাশিত হইতে পারে। *

সত্যই ইতিহাসের প্রধান ভিত্তি। ঐতিহাসিকের পক্ষে সত্য গোপন করা সত্যের অপলাপ করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রচার করা সমূহ অপরাধের কার্য্য। কিন্তু অনেক সময়ে ইচ্ছা থাকিলেও প্রমাণাভাবে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে ঐতিহাসিককে এই অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। ইহার জন্য কাহারও নিন্দা করা যায় না। কিন্তু অনেক সময়ে ইতিহাসলেখক স্বাধীনভাবে সত্য প্রকাশ করিবার অধিকার প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহাকে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। রাজপুরুষবর্গের মনোরঞ্জন করিতে হইলে সত্যের মর্য্যাদা পদদলিত হইয়া বিদ্বৎসমাজে কলঙ্কিত হইতে হয়, ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে রাজপুরুষবর্গের বিরাগভাজন হইয়া নানারূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। জ্ঞানানুশীলনতৎপর সুধীবর্গের পথ কুসুমাবৃত নহে, তাহা সবিশেষ কণ্টকাকীর্ণ। সক্রেতিশকে সত্য প্রকাশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল; গ্যালিলিওকে কারাবাস করিতে হইয়াছিল,— সে সকল অবশ্যই সেকালের অনুন্নত মানবসমাজের ক্ষীণ দৃষ্টির পরিচয়স্থল। কিন্তু একালে সুসভ্যসমাজে মানবদৃষ্টি বহুদূরপ্রসারিত নক্ষত্রলোক

---

* বিলাতের সুবিখ্যাত 'টাইমস্' পত্রে ম্যালিসনের সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনায় লিখিত হইয়াছিল—"The style is eloquent, the grasp of the subject as firm, the arrangement as clear, and, above all, there is the same evidence of industry, the same evident desire to be impartial."

ভেদ করিয়া সৌরজগতের অতীত রাজ্যে গমন করিতে সক্ষম হইলেও, কোন কোন বিষয়ে এখনও ক্ষুদ্র দৃষ্টির পরিচয় দিতে ত্রুটি করি না! ম্যালিসন ইহার একটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়া আপন সত্যনিষ্ঠার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কনিংহামলিখিত সুবিখ্যাত শিখইতিহাসের উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন;—"Looking at the policy of annexation from the basis of Cunningham's book, that policy was undoubtedly unjust. Cunningham's book would be widely read, and would influence the general verdict. Now, Lord Dalhousie was not only a despot, but a despot who hated the expression of free opinion and of free thought; he would be served only by men who would think as he bade them think. That an officer holding a high political office should write a book which, by the facts disclosed by it, reflected however indirectly, on his policy, was not to be endured. With one stroke of the pen, he removed Cunningham from his appointment at Bhopal. Cunningham, stunned by the blow, entirely unexpected died of a broken heart."*

কনিংহামের গ্রন্থের বিপরীত অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। ম্যালিসন এই সকল স্থলে রাজকীয় কাগজপত্রের অনুকরণ না করিয়া কনিংহামের গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে

* Preface to the First Edition of Malleson's Decisive Battles of India.

ম্যালিসন স্বকৃত ভারতযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন ;—

"I dismiss the despatches of the day as utterly unreliable, abounding in exaggerations of all sorts; worthy, in that respect, to be classed with the bulletins of Napoleon. But Cunningham is a great authority *

সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ও রাজপুরুষবর্গের কার্য্যপ্রণালীর সমালোচনা উপলক্ষে যিনি এরূপ নিরপেক্ষভাবে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ বহন করিবার সময়ে ঐতিহাসিক গৌরব নষ্ট করিবার জন্য কলিকাতার ইংরাজ সংবাদপত্রসম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কি নিতান্তই কুৎসামূলক নহে?

বঙ্গভাষা।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচন্দ্র সেন-প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এই শ্রেণীর বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে পুস্তক খানি সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করিয়া প্রথম সংস্করণের প্রান্তশেষে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী উদারহৃদয় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজা এই বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করেন। রোগ-শয্যা-শায়ী লেখক মহাশয় সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আশা করি অর্থ সাহায্যঅভাবে তাঁহার এই ইচ্ছা নিষ্ফল হইবে না।

এই গ্রন্থের আরম্ভভাগে বঙ্গভাষা সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে লেখকের চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা পদে পদে পাঠকেরও চিন্তাশক্তির উদ্রেক করিয়া থাকে। সেই সঙ্গে মনে এই খেদটুকুও জন্মে যে বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্বসম্বন্ধে আলোচনা যথোচিত বিস্তৃত হয় নাই। বিষয়টির কেবল অবতারণা হইয়াছে তাহাকে আরো খানিকটা অগ্রসর দেখিলে মনের ক্ষোভ মিটিত।

কিন্তু বাঙ্গালীর ক্ষোভের কারণ, খেদের বিষয় বিস্তর আছে। অনেক জিনিস হওয়া উচিত ছিল যাহা হয় নাই, এবং সে জন্য আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু দায়ী। অথচ যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া অনিবার্য্য কারণে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই সমালোচকের উচ্চ আসন হইতে বিশেষ করিয়া তাঁহারই কৈফিয়ৎ তলব করা শক্ত নহে—কিন্তু আমাদের সে অভিপ্রায় নাই। এবং এ কথাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, সমালোচ্য গ্রন্থে বঙ্গভাষা-সম্বন্ধে অধ্যায় কয়েকটী পাঠ করিয়া এই বিষয়ে আমাদের কৌতূহল বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত এবং চেষ্টা নূতন পথে ধাবিত হইয়াছে। পাঠকের মনকে এইরূপে প্রবুদ্ধ করাই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

সাময়িক রাজকীয় ব্যাপার ব্যতীত আর কোনো বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে আলোচনা নাই। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি প্রকৃতি এবং ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুটা কথা আন্দোলন করেন এমন দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। অতএব বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের নিগূঢ় কথা যিনি সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত তাঁহাকে সাহায্য বা সংশোধন করিবার উপায় দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাকে একাকী উপক্রমণিকা হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত

সমস্তই স্বচেষ্টায় সমাধা করিতে হইবে। তিনিই যন্ত্র তৈরি করিবেন, তার চড়াইবেন, সুর বাঁধিবেন, বাজাইবেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রোতার কার্য্যও তাঁহাকে একলাই সারিতে হইবে। এমন অবস্থায় একথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, তাঁহার সকল কাজ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয় নাই।

কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সেখানে আমাদের সকল আশার প্রতিষ্ঠা আমাদের মাতৃভাষাতত্ত্বনির্ণয়ের আশাও সেই বিদেশীয়ের কাছে। আমরা যাঁহাদের নিকটে স্বায়ত্তশাসন, কৌন্সিলের আসন, যথেচ্ছ-ভাষণ দাবী করি, তাঁহাদেরই নিকটে অসঙ্কোচে বেদের ভাষা, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস, ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত এবং অবশেষে নিজ ভাষার রহস্যব্যাখ্যাজন্য হাতযোড় করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।

এক্ষণে, বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্ব যিনি আলোচনা করিতে চান, বীম্‌স্‌ সাহেবের তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং হর্ণ্‌লে সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ তাঁহার পথ অনেকটা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে দুটো একটা ভুল ত্রুটি বা স্খলন বাহির করা গৌড়ী ভাষীদের পক্ষে অসম্ভব না হইতে পারে কিন্তু যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও নম্রতার সহিত তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না।

সংসারে জড়পদার্থের রহস্য যথেষ্ট জটিল এবং দুর্গম, কিন্তু সজীব পদার্থের রহস্য একান্ত দুরূহ। ভাষা একটা প্রকাণ্ড সজীব পদার্থ। জীবনধর্ম্মের নিগূঢ় নিয়মে তাহার বিচিত্র শাখা প্রশাখা কতদিকে কতপ্রকার অভাবনীয় আকার ধারণ করিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে তাহার অনুসরণ করিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। বীম্‌স্‌ সাহেব, হর্ণ্‌লে সাহেব, হিন্দী ব্যাকরণকার কেলগ্‌ সাহেব, মৈথিলী ভাষাতত্ত্ববিৎ গ্রিয়র্সন সাহেব বিদেশী হইয়া ভারতবর্ষ প্রচলিত

আর্য্যভাষার পথলুপ্ত অপরিচিত জটিল মহারণ্যতলে প্রবেশপূর্ব্বক অশ্রান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিভার বলে যে সকল প্রচ্ছন্ন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা লাভ করিয়া এবং বিশেষতঃ তাঁহাদের আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও সন্ধানপরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের স্বদেশী-ভাষার সহিত সম্পর্কশূন্য স্বদেশহিতৈষীআখ্যাধারীদের লজ্জা ও বিনতি অনুভব করা উচিত।

প্রাকৃত ভাষার সহিত বাঙ্গলার জন্মগত যোগ আছে সে সম্বন্ধে দীনেশচরণ বাবু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এবং ডাক্তার হর্ণ্‌লের সহিত একমত।

হর্ণ্‌লে সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে কথিত প্রাকৃত ভাষা দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত ছিল। শৌরসেনী ও মাগধী। মহারাষ্ট্রী লিখিত ভাষা ছিল মাত্র এবং প্রাকৃতভাষা ভারতবর্ষীয় অনার্য্যদের মুখে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যে ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার নাম ছিল পৈশাচী।

প্রাচীন ব্যাকরণকারগণ যে সকল ভাষাকে অপভ্রংশ ভাষা বলিতেন তাহাদের নাম এই :—আভীরী (সিন্ধি, মাড়োয়ারী) আবন্তী (পূর্ব্ব রাজপুতানা), গৌর্জ্জরী (গুজরাটী), বাহ্লিকা (পঞ্জাবী), শৌরসেনী (পাশ্চাত্য হিন্দী), মাগধী অথবা প্রাচ্যা (প্রাচ্য হিন্দী), ওড্রী (উড়িয়া), গৌড়ী (বাঙ্গলা), দাক্ষিণাত্যা অথবা বৈদর্ভিকা (মারাঠী), এবং সৈংহলী (নেপালী ?)।

উক্ত অপভ্রংশতালিকার মধ্যে শৌরসেনী ও মাগধী নাম আছে কিন্তু মহারাষ্ট্রী নাম ব্যবহৃত হয় নাই। মহারাষ্ট্রী যে ভারতবর্ষীয় কোন দেশবিশেষের কথিত ভাষা ছিল না তাহা হর্ণ্‌লে সাহেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ আধুনিক মহা-রাষ্ট্রদেশপ্রচলিত ভাষার অপেক্ষা পাশ্চাত্য হিন্দি ভাষার

সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত নাটকে দেখা যায় শৌরসেনী গদ্যাংশে এবং মহারাষ্ট্রী পদ্যাংশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা হইতেও কতকটা প্রমাণ হয় মহারাষ্ট্রী সাহিত্য-ভাষা ছিল, কথায় বার্ত্তায় তাহার ব্যবহার ছিল না।

কিন্তু, আমাদের মতে, ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, মহা-রাষ্ট্রী কোন কালেই কথিত ভাষা ছিল না এবং তাহা সাহিত্য-কারদের রচিত কৃত্রিম ভাষা। সর্ব্বদা ব্যবহারের ঘর্ষণে চলিত-কথায় ভাষার প্রাচীন রূপ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে, কিন্তু কাব্যে তাহা বহুকাল স্থায়িত্ব লাভ করে। বাহিরের বিচিত্র সংস্রবে পুরুষসমাজে যেমন ভাষা এবং প্রথার যতটা দ্রুত রূপান্তর ঘটে অন্তঃপুরের স্ত্রী সমাজে সেরূপ ঘটে না;—কাব্যেও সেইরূপ। আমাদের বাঙ্গলা কাব্যের ভাষায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা কাব্যে, "ছিল" শব্দের স্থলে "আছিল," প্রথম পুরুষ "করিল" শব্দের স্থলে "করিলা", "তোমাদিগকে"-স্থলে 'তোমা সবে" প্রভৃতি যে সকল রূপান্তর প্রচলিত আছে তাহাই যে কথিত বাঙ্গলার প্রাচীন রূপ ইহা প্রমাণ করা শক্ত নহে। এই দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, প্রাকৃত সাহিত্যে মহারাষ্ট্রী নামক পদ্য ভাষা শৌরসেনী অপভ্রংশ অপেক্ষা প্রাচীন আদর্শমূলক হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শৌরসেনী-অপভ্রংশ প্রাকৃত সাহিত্যের গদ্য ভাষা। সাহিত্য-প্রচলিত গদ্য ভাষার সহিত কথিত ভাষার সর্ব্বাংশে ঐক্য থাকে না তাহাও বাঙ্গলা ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়। একটা ভাষা যখন বহুবিস্তৃত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেই—কিন্তু লিখিবার

ভাষা নিয়মে এবং স্থায়ী আকারে বদ্ধ হইয়া দেশান্তর ও কালান্তরের বিকৃতি অনেকটা প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক নানাস্থানীয় পণ্ডিতসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ও বোধগম্য হইয়া থাকে, এবং তাহাই স্বভাবত ভদ্রসমাজের আদর্শ ভাষারূপে পরিণত হয়। চট্টগ্রাম হইতে ভাগলপুর এবং আসামের সীমান্ত হইতে বঙ্গসাগরের তীর পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার বিচিত্ররূপ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সাহিত্যভাষায় স্বতই একটি স্থির আদর্শ রক্ষিত হইয়া থাকে। সুন্দররূপে, সুশৃঙ্খল রূপে, সংহতরূপে, গভীররূপে ও সূক্ষ্মরূপে ভাবপ্রকাশের অনুরোধে এ ভাষা যে কতক পরিমাণে কৃত্রিম হইয়া উঠে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু এই সাহিত্যগত ভাষাকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক অপভাষার মূল আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে এইরূপ একদিকে মাগধী ও অন্য দিকে শৌরসেনী-মহারাষ্ট্রী এই দুই মূল প্রাকৃত ছিল। অদ্য ভারতবর্ষে যত আর্য্য ভাষা আছে তাহা এই দুই প্রাকৃতের শাখা-প্রশাখা।

এই দুই প্রাকৃতের মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। এমন কি, হর্ণ্‌লে সাহেবের মতে এক সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। তাহা পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে পরিব্যাপ্ত হয়। শৌরসেনী আর একটি দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চিমদেশ অধিকার করে। হর্ণ্‌লে সাহেব অনুমান করেন, ভারতবর্ষে পরে পরে দুইবার আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ প্রবেশ করে। তাহাদের উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকিলেও কতকটা প্রভেদ ছিল।

প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণ নিম্নলিখিত ভাষাগুলিকে মাগধী প্রাকৃতের শাখারূপে বর্ণনা করিয়াছেন।—মাগধী, অর্দ্ধমাগধী,

দাক্ষিণাত্যা, উৎকলী এবং শাবরী। বেহার এবং বাঙ্গালার ভাষাকে মাগধীরূপে গণ্য করা যায়। মাগধীর সহিত শৌরসেনী বা মহারাষ্ট্রী মিশ্রিত হইয়া অর্দ্ধ মাগধীরূপ ধারণ করিয়াছে,—ইহা যে মগধের পশ্চিমের ভাষা অর্থাৎ ভোজপুরী তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদর্ভ অর্থাৎ বেরার ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশের ভাষা দাক্ষিণাত্যা নামে অভিহিত। অতএব ইহাই বর্ত্তমান মরাঠিস্থানীয়। উৎকলী উড়িষ্যার ভাষা, এবং এক দিকে দাক্ষিণাত্যা ও অন্যদিকে মাগধী ও উৎকলীর মাঝখানে শাবরী।

দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য হিন্দী, মৈথিলী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্রী, এবং আসামী, এইগুলিই বাঙ্গালার স্বজাতীয় ভাষা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাফিরিস্থানের কাফিরীভাষা এবং আফগানিস্থানের পুষ্‌তু মাগধীপ্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত, এবং সে হিসাবে বাঙ্গালার কুটুম্বশ্রেণীয়। শৌরসেনীপ্রাকৃত মাঝে পড়িয়া মাগধী প্রাকৃতের বিস্তারকে খণ্ডীকৃত করিয়া দিয়াছে।

এক্ষণে বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব প্রকৃতরূপে নিরূপণ করিতে হইলে, প্রাকৃত, পালী, প্রাচ্যহিন্দী, মৈথিলী, আসামী, উড়িয়া এবং মহারাষ্ট্রী ব্যাকরণ পর্য্যালোচনা ও তুলনা করিতে হয়।

কথাটা শুনিতে কঠিন, কিন্তু বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্বনির্ণয় জীবনের একটা প্রধান আলোচ্যবিষয়রূপে গণ্য করিয়া লইলে এবং প্রত্যহ অন্ততঃ দুই এক ঘণ্টা নিয়মিত কাজ করিয়া গেলে এ কার্য্য একজনের পক্ষে অসাধ্য হয় না। বিশেষতঃ উক্ত ভাষা কয়টির তুলনামূলক এবং স্বতন্ত্র ব্যাকরণ অনেকগুলিই পাওয়া যায়। এবং এইরূপ সম্পূর্ণ একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের গুটিকতক দৃষ্টান্ত না থাকিলে আমাদের বঙ্গসাহিত্য যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারিবে না।

বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্বসন্ধানের একটি ব্যাঘাত, প্রাচীন পুঁথির

দুষ্প্রাপ্যতা। কবিকঙ্কণচণ্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যগুলি জনসাধারণের সমাদৃত হওয়াতে কালে কালে অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন আদর্শ পুঁথি কোন এক পুস্তকালয়ে যথাসম্ভব সংগৃহীত থাকিলে অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে সুবিধার বিষয় হয়। সাহিত্য পরিষদের অধিকারে এইরূপ একটি পুস্তকালয় স্থাপিত হইতে পারিবে ইহাই আমরা আশা করি।

এই সকল গুরুতর বিঘ্নসত্ত্বে কোনও চিন্তাশীল সন্ধানতৎপর ব্যক্তি যদি বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বনির্ণয়ে নিযুক্ত হন, তবে তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ হইলেও ভবিষ্যতের পথ খনন করিয়া রাখিবে। রোগের তাপ, জীবিকার চেষ্টা এবং কর্ম্মান্তরের অনবকাশের মধ্যেও দীনেশচরণ বাবু সেই দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া মহৎ অনুষ্ঠানের সূচ[illegible] সেই জন্য তিনি আমাদের সম্মান এবং কৃ[illegible] পাত্র হইয়াছেন।

দীনেশ চরণ বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

Every county, almost every parish in England, has its annals; but in India, vast provinces, greater in extent than the British Islands, has no individual history whatever.—"Sir W. W. Hunter."

মা ভৈঃ। একে ইতিহাসের কথা, তাহাতে বাংলায় লেখা;

সুতরাং প্রবন্ধারম্ভেই অভয়দান করা আবশ্যক। রণ নাই, রণ কোলাহলও নাই; বিজয়োন্মত্ত গোলন্দাজদলের সঘন সঞ্চালিত কামান গর্জ্জন, এমন কি পদাতিক সেনার পটপটায়মান বন্দুক নিঃস্বনটিও কর্ণশূল উৎপাদন করিবে না। আজ কেবল—ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ!

আমাদের ইতিহাস নাই। ইহার জন্য কেবল যে আমরাই একাকী হায়, হায়, করিয়া মরিতেছি তাহা নয়; কত সহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষেরাও কত না হা হুতাশ করিয়া গিয়াছেন! আমাদের ইতিহাস নাই, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। নাই কেন,—সে বিষয়ে কিন্তু বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিতে পাওয়া যায়।

ইংরাজদিগের বিশ্বাস,—আমাদের ইতিহাস ছিল না; সেই জন্যই তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের লোকের বিশ্বাস,—আমাদের শিল্প ছিল, বিজ্ঞান ছিল, দর্শন ছিল, জ্যোতিষ ছিল, রাজ্য ছিল, রাজবিধি ছিল,—ছিল না কি কেবল ইতিহাস? না থাকিলে আমাদের ভাষায় তদ্বোধক শব্দ রহিয়াছে কেন?

লোকের ধারণা,—আমাদেরও ইতিহাস ছিল। কেবল ছিল, কেন, এতই অধিক ছিল, যে তাহাতে বহুশত পুস্তকাধার পূর্ণ হইতে পারিত। কিন্তু দুষ্ট যবন—ম্লেচ্ছ গোখাদক বর্ব্বর—তাহার কথা আর কি বলিব? সে একদিন মিশরের মহীয়সী কীর্ত্তি লোপ করিবার জন্য পুস্তকালয়ে অনল দান করিয়াছিল; আমাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থরাশিও তাহারই অত্যাচারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে!

যাহারা হিন্দু দেবমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তদুপকরণ সাহায্যে মুসলমানের মসজেদ চূড়া সমুন্নত করিবার আশায় কাশী কাঞ্চি, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সর্ব্বত্র লৌহদণ্ড হস্তে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া বেড়াইত,

তাহাদের অত্যাচারেই যে আমাদের ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে কথা সহজেই স্বীকার করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। মানুষ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, কিন্তু মানুষ স্বভাবতই সরল বিশ্বাসী; তাহাকে যাহা-তাহা দিয়া জগতের জটিলতম সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা কর, সে সরল বিশ্বাসে তাহাকে সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপে সে ভূকম্পন চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণাদি নৈসর্গিক ব্যাপারের তত্ত্বগুলি অতি সহজে বুঝিয়া লইয়াছে! আমাদের ইতিহাস নাই কেন,—তাহাও এইরূপ সহজ উপায়ে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে। আজ আবার তাহার পুনরালোচনা কেন?

কৈফিয়ৎ না পাইলে অনেকে হয়ত এইখানেই গ্রন্থে ডুরি বাঁধিতে চাহিবেন; তাই উপক্রমণিকাতেই উপসংহারের আভাস দিতে হইতেছে। আমাদের ইতিহাস নাই, ইহা যখন প্রত্যক্ষ সত্য, তখন ইহার অবশ্যই কারণ আছে। দুষ্ট যবনের অত্যাচার সত্য হইলেও তাহা ইতিহাস না থাকিবার কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমাদের যে আদৌ ইতিহাস ছিল, তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত সত্য সিদ্ধান্ত নহে!

সেকালে কোন দেশেই ইতিহাস ছিল না। আমরা যাহাকে ইতিহাস বলি, সে কালে তাহাকে ইতিহাস বলিত না। কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ কালের বা বিশেষ রাজ বংশের বা বিশেষ যুদ্ধ কলহের ঘটনাবিবৃতি মাত্রই সেকালে ইতিহাস নামে পরিচিত ছিল। সমগ্র দেশের সমুদায় রাজবংশের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ কার্য্যকারণশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীমতে সংকলিত হইত না বলিয়া কোন দেশেরই সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পুরাতন ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় না।

দুই চারিজন হিন্দু রাজা রাজসূয় যজ্ঞে রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি

লাভ করিবা সনাট পদবীতে আরোহণ করিয়া থাকিলেও, পুরা কালে মহাভারত সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। এক এক প্রদেশ এক একটি খণ্ডরাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই সকল খণ্ডরাজ্যেও নানা সময়ে নানা রাজ বংশাবতংস স্বাধীন নরপতিগণ রাজসিংহাসন অলংকৃত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস সংকলিত হওয়া দূরে থাকুক, জনসমাজে তাহার উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিবার অবসর পাইত না।

দুষ্ট যবনের অধিকারে আসিয়াই ইতিহাস ভারত-সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করে; সেই সময়ে সমগ্রদেশ এক রাজার অধীন হইতেছিল বলিয়া,সমগ্র দেশের ইতিহাস সংকলনের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। মুসলমানেরা পুরাতন গ্রন্থাদির অনুসন্ধান করিয়া যথাসাধ্য ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার কোন কোন গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে, কিন্তু তাহা এখনও সাহিত্য সেবক সমাজে যথোচিত সমাদর লাভ করে নাই।

এখন সমগ্র ভারতবর্ষ এক মহা সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা এই মহা সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া তাহার শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা যথাসাধ্য ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বিদেশীয় লোক, তাঁহাদের চেষ্টায় পুরাকাহিনী যথাযথরূপে সংকলিত বা বর্ণিত হওয়া অসম্ভব। সেই জন্য তাঁহাদের যত্ন চেষ্টায় আমাদের ইতিহাস সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই। অসঙ্গত স্বজাতিবাৎসল্যের খাতিরেই যে তাঁহারা অনেক কথা গোপন করিয়া, অনেক কথা অতিরঞ্জিত করিয়া, অনেক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাদের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা কালক্রমে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, এবং

বর্ত্তমান যুগের বিদেশীয় ইতিহাস লেখকেরাও তাহা প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টায় আমাদের ইতিহাস বহুল পরিমাণে কলঙ্কমুক্ত হইলেও সর্ব্বথা কলঙ্কপরিশূন্য হইতে পারিতেছে না।

দেশের লোকে দেশের ইতিহাস সংকলনের চেষ্টা না করিলে, পরের চেষ্টায় যাহা সম্ভব, কেবল তাহাই হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

দেশের লোকের পক্ষে আমাদের ইতিহাস সংকলনের অন্তরায় অনেক। কাহারও বিচ্ছিন্ন শক্তিতে এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশের দশা কাহারও অপরিজ্ঞাত নাই; এদেশের মাটির দোষ চিরপ্রসিদ্ধ, তাহা লইয়া শিব গড়াইতে বসিলেও অবশেষে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। অন্যান্য দেশে ঐতিহাসিক সমিতির যত্নে, পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে বহুদিনে বহুজনের চেষ্টায় ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে নানা রূপ সদনুষ্ঠান হইতেছে; পুস্তক পুস্তিকা ও সংবাদ পত্রাদিও প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু ইতিহাস সংকলনের জন্য আজিও রীতিমত কোন উদ্যোগ হয় নাই। আমরা চেষ্টা করি নাই বলিয়াই আমাদের ইতিহাস লিখিত হয় নাই। আমরা চেষ্টা করিলে যথাকালে আমাদের ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা বহুজনসাপেক্ষ।

ইতিহাস সংস্কারকের উপাদানের অভাব নাই। উপাদানগুলি সংগ্রহ করা, তাহাকে যথারীতি বিশ্লেষণ করিয়া সত্যোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা এবং যাহা সত্য তাহাই অবলম্বন করিয়া ইতিহাস সংকলন করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। ইহার জন্য স্বদেশের সাহিত্যসেবকদিগের সমবেত চেষ্টার আবশ্যক, স্বদেশের ধনীসন্তানদিগের

সহানুভূতির প্রয়োজন, এবং ভাবতাধিপতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের কৃপা কটাক্ষের আবশ্যক।

বাংলার ইতিহাস সংকলনের অনেক উপাদান এখন রাজদপ্তরে নীরবে কীটদষ্ট হইতেছে। একবার একজন প্রতিভাশালী বঙ্গ-সাহিত্য সেবক তাহা হইতে ইতিহাস সংকলনের জন্য রাজানুমতি চাহিয়া ছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ব্যক্তিগত প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। ইহাব পর সেই সকল রাজদপ্তরের অনেক কাগজ পত্রের সারমর্ম্ম ইংরাজ সাহিত্য সেবকদিগের যত্নে প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহারা রাজানুমতি লইয়াই গ্রন্থসংকলনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদেব দেশের কত সভাসমিতি কত বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কেহ একবার বাঙ্‌নিষ্পত্তিও করেন নাই।

এখনও যে সকল তথ্য সংকলন করা সম্ভব, কালে ক্রমে তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। বঙ্গসাহিত্যসেবকগণ উদাসীন; আমাদের ইতিহাস নাই বলিয়া আক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রসঙ্গ কথা।

অল্পকাল হইল বাঙ্গলাদেশের তৎসাময়িক শাসনকর্ত্তা ম্যাকেঞ্জি সাহেবকে সভাপতির আসনে বসাইয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশনের দুরবস্থা উপলক্ষ্যে নিজের সম্বন্ধে করুণা, স্বদেশ সম্বন্ধে আক্ষেপ, এবং স্বদেশীয়ের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে একটা নালিশের সুর ছিল। বাদী ছিলেন তিনি, প্রতিবাদী ছিল তাঁহার অবশিষ্ট স্বজাতিবর্গ এবং জজ্ ও জুরী ছিল ম্যাকেঞ্জিপ্রমুখ রাজপুরুষগণ। এ বিচারে আমাদের নিরপরাধে খালাস্ পাইবার আশামাত্র ছিল না।

কবুল করিতেই হইবে আমাদের অপরাধ অনেক আছে—এবং সে জন্য আমরা লজ্জিত—অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য-বশতঃ লজ্জাবোধও আমাদের নাই। কিন্তু সেই অপরাধ-খণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়লোকদের উপর। মানব সমাজের বিচারালয়ে বাঙ্গালীর নাম আসামীশ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। নালিশ করিবার লোক ঢের আছে এবং বাঙ্গালীর নামে নালিশ শুনিবার লোকও রাজপুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে।

প্রাণীদের মধ্যে মনুষ্যজাতিটা খুব শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ তথাপি ইতিহাসের আরম্ভ ভাগ হইতেই দেখা যায় মনুষ্যের উপকার করা সহজ কাজ নহে। যাঁহারা ইহাকে বিপুল চেষ্টা ও সুদীর্ঘ সময়সাধ্য বলিয়া না জানেন তাঁহারা যেন সাধারণের উপকার করার কাজটায় হঠাৎ হস্তক্ষেপ না করেন। যদি করেন তবে অবশেষে পাঁচজনকে ডাকিয়া বিলাপ পরিতাপ ও সাধারণের প্রতি দোষারোপ করিয়া সান্ত্বনা পাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে। তাহা দেখিতেও শোভন হয় না, তাহার ফলও নিরুৎসাহজনক, এবং তাহাতে গৌরবহানি ঘটে।

অবশ্য সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি মহেন্দ্র বাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ আছে এবং সেই অনুরাগের টানে তিনি অনেক করিয়াছেন। কিন্তু অনেক করিয়াছেন বলিয়া বিলাপ না করিয়া তাঁহাকে যে আরও অনেক করিতে হয় নাই সে জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত ছিল। বিজ্ঞান প্রচারের উৎসাহে কোন মহাপুরুষ জেলে গিয়াছেন, কোন মহাপুরুষকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। বড় লোক হইয়া বড় কাজ করিতে গেলে এরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে।

মহেন্দ্র বাবুর অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিয়া তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ফল অনেকে হইয়াছেন। ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত বঙ্গদেশে এমন কয়টা অনুষ্ঠান আছে যে নিজের ঘর দুয়ার বাঁধিতে পারিয়াছে, বহুব্যয়সাধ্য আস্‌বাব সংগ্রহ করিয়াছে, যাহার স্থায়ী অর্থের সংস্থান হইয়াছে, এবং যাহার সভাপতি দেশের ছোটলাট বড়লাট সাহেবকে সম্মুখে বসাইয়া নিজের মহৎ ত্যাগ স্বীকার ঘোষণাপূর্ব্বক অশ্রুপাত করিবার দুর্লভ অবসর পাইয়াছে। যতটা হইয়াছে বাঙ্গালী তাহার জন্য ডাক্তার সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু সে জন্য তিনিও বাঙ্গালীর নিকট কতকটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিতেন।

বড়লোকেরা বড় কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা আলাদিনের প্রদীপ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁহারা রাতারাতি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না। আমাদের দুর্ভাগা দেশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের নাম ছোটখাট আলাদিনের প্রদীপ

বিশেষ। সেই প্রদীপের সাহায্যে এবং ডাক্তার সরকারের নিজের নাম ও চেষ্টার জোরে এই বিজ্ঞানচর্চ্চাবিহীন বঙ্গদেশে অকস্মাৎ পাকা ভীৎ এবং যন্ত্রতন্ত্রসহ এক সায়ান্স্-অ্যাসোসিয়েশন উঠিয়া পড়িল। ইহাকে এক প্রকার ভেল্কী বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বাস্তব জগতে আরব্য উপন্যাস অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভেল্কীর জোরে জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা সম্ভব নহে। আজ প্রায় সিকি শতাব্দীকাল বাঙ্গলা দেশে বিজ্ঞানের জন্য একখানা পাকা বাড়ি, কতকগুলি আস্‌বাব্ এবং কিঞ্চিৎ অর্থ আছে বলিয়াই যে বিজ্ঞান আপনা-আপনি গোকুলে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে এমন কোনও কথা নাই। আরও আস্‌বাব্ এবং আরও টাকা থাকিলেই যে বিজ্ঞান আরও ফুলিয়া উঠিবে এমনও কোন বৈজ্ঞানিক নিয়ম দেখা যায় না।

অবশ্য, দেশ কাল পাত্র সমস্তই ষোলোআনা অনুকূল যদি হয় তবে তাহার মত সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারেনা। কিন্তু সর্ব্বত্রই প্রায় কোন-না-কোনটা সম্বন্ধে টানাটানি থাকেই;—আমাদের এ দরিদ্র দেশে ত আগাগোড়াই টানাটানি। অন্ততঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনি কাল, তেমনি পাত্র! এখানে সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশন্ নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে, বিজ্ঞান একদমে বাঁশি বাজাইয়া রেলগাড়ির মত ছুটিতে থাকিবে অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না। গাড়ি চলেনা বলিয়া দেশাধিপতির নিকট দেশের নামে নালিশ রুজু না করিয়া আপাততঃ রাস্তা বানাইতে সুরু করা কর্ত্তব্য।

রাস্তা বানাইতে গেলে নামিয়া আসিয়া একেবারে মাটিতে হাত লাগাইতে হয়। আমাদের দেশের বড়লোকদের নিকটে সে প্রস্তাব করিতে সঙ্কোচ বোধ করি, কিন্তু অগত্যা না করিয়া থাকা যায় না। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞান

চর্চ্চার গোড়া পত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স আসোসিয়েশন্ যদি গত পঁচিশ বৎসর এই কার্য্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষবর্গের সমুচ্চ প্রাসাদবাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদান দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইত।

নালিষ এই যে, বিজ্ঞানসভা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্তমত খোরাকা এবং আদর পায় না। কেমন করিয়া পাইবে? যাহারা বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বোঝেনা তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাততঃ মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চ্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে এবং সফলতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দিগন্তে বিলীন হইবে না।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণদের জ্ঞানানুশীলনের অধিকার ছিল। ব্রহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ সেই কারণেই ক্রমে ম্লান এবং বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমে কর্ম্ম নিরর্থক, ধর্ম্ম পুঁথিগত, এবং পুঁথিও মুখস্থ বিদ্যায় পরিণত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ, নিম্নের মাধ্যাকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে চতুর্দ্দিক অনুন্নত সেখানে সঙ্কীর্ণ উন্নতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অদ্য ব্রাহ্মণ নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহার তিন দিনের উপনয়ন ব্রহ্মচর্য্যের বিদ্রূপমাত্র, তাহার মন্ত্রার্থজ্ঞানহীন সংস্কার বর্ব্বরতা। তাহার কারণ, অশিক্ষিত বিপুলবিস্তৃত শূদ্র সম্প্রদায় আপন দুরব্যাপী প্রকাণ্ড মূঢ়তার গুরুভারে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মণ্যের উচ্চশিরকে ধূলিসাৎ করিয়া জয়ী হইয়াছে।

অদ্য ইংরাজিশিক্ষিতগণ কিয়ৎপরিমাণে সেই ব্রাহ্মণদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাধারণের কাছে ইংরাজি ভাষা বেদের মন্ত্র অপেক্ষা সরল নহে। এবং অধিকাংশ জ্ঞান বিজ্ঞান ইংরাজিভাষার কড়া পাহারার মধ্যে আবদ্ধ।

তাহার ফল এই, বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি সমাজে তাহার কোন চর্চ্চা নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিদ্যার প্রধান গৌরব দাঁড়াইয়াছে অর্থোপার্জ্জনের উপায়রূপে।

সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশন্ সেই স্বল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণ-স্থানীয়দের জন্য আপন শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। যে কয়জনা ইংরাজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরাজি ভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে। বাকী সমস্ত বাঙ্গালীর সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই অথচ সায়ান্স্ অ্যাসোয়িয়েশনের জন্য বাঙ্গালী বিশেষ উদ্যোগী হইতেছে না এ আক্ষেপ তাহার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞান চর্চ্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তন ক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্ব্ব-প্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধসংস্কার সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মত দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারম্বার দেখি-য়াছি আমাদের দেশের ইংরাজি-শিক্ষিত বিজ্ঞান-ঘেঁষা ছাত্রেরাও কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক-সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করেন। যেমন পাথুরে জমির উপর আধহাত-খানেক পুষ্করিণীর পাঁক তুলিয়া দিয়া তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে গাছটা প্রথম প্রথম খুব ঝাড়িয়া মাথা তুলিয়া ডালে পালায় গজাইয়া উঠে, অবশেষে শিকড় যেমনি নীচের কঠিন স্তরে গিয়া ঠেকে অমনি অকস্মাৎ মুসড়িয়া মরিয়া যায়—আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষারও সেই অবস্থা।

ঘরে বাহিরে চারিদিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চ্চা এদেশে স্থায়ীরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। নতুবা আপাততঃ দুই দিনের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই—

কেন না চারিদিকের দিগন্ত প্রসারিত মূঢ়তা দিনে নিশীথে অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণ করিয়া সঙ্কীর্ণমূল উচ্চতাকে আপনার সহিত সমভূম করিয়া আনিবে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধোগতির প্রধান কারণ, এই ভিত্তির সঙ্কীর্ণতা, ব্যাপ্তির অভাব, একাংশের সহিত অপরাংশের গুরুতর অসাম্য।

অথচ বাঙ্গালা ভাষায় ইংবাজি-অনভিজ্ঞদের কাছে বিজ্ঞান-প্রচারের কোন উপায় এদেশে নাই। ইহা ব্যয়সাধ্য, চেষ্টাসাধ্য, ইহাতে আশু ফললাভেব আশাও নাই,—কোন ব্যক্তিবিশেষের একান্ত উৎসাহরক্ষার উপযোগী কোন উত্তেজনা ইহাতে দেখা যায় না। ইহাতে অর্থনাশ ছাড়া অর্থাগমেরও সম্ভাবনা অল্প। বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টার কাজ—বিজ্ঞানের যাথাতথ্য রক্ষাপূর্ব্বক তাহাকে জনসাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া সরল ভাষায় প্রকাশ করাও শক্ত।

অতএব যেমন করিয়াই দেখি সায়ান্স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের ন্যায় সামর্থ্যশালী বিশেষ সভার দ্বারাই এই কার্য্য সম্ভবপর বোধ হয়। ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য অনেক স্কুল কালেজ আছে,—এবং তাহার গ্রন্থ ও আচার্য্যের অভাব নাই। এমন কি, যাঁহারা ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিক্ষা সমাধা করিতে চান তাঁহারা বিলাতে গিয়াও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু নানা কারণে ইংরাজি শিক্ষায় বঞ্চিত আমাদের অধিকাংশ, আমাদের সর্ব্বসাধারণ, আমাদের প্রকৃত দেশ সায়ান্স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারাও উপেক্ষিত; অথচ এমনি দৈব বিড়ম্বনা,—সায়ান্স্‌-অ্যাসোসিয়েশন সেই দেশের নামে অবহেলার অভিযোগ আনিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ায় কার্য্য যথোচিত রূপে অগ্রসর হইতেছে না। এই

কার্য্যে সাহিত্য পরিষদের সহিত সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশনের যোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িকপত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিজের উপযোগিতা উপকারিতা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণ করা আবশ্যক। তবেই দেশের সহিত সভার দান প্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কেবল মাত্র বিলাপের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। এমন কি, রাজপ্রতিনিধির মধ্যস্থতাদ্বারাও বেশি-কিছু হইবে না। রাজা সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশনের অর্থাগমের সুযোগ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু তাহাকে সফল করিতে পারেন না।

যাহাই হোক্ সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশন্ যদি যথার্থ পথে কাজ করিতে অগ্রসর হন তবে তাঁহার ভৎর্সনা সহিতে আমরা প্রস্তুত আছি; কিন্তু কাজও করিবেন না, চোকও রাঙাইবেন, দেশকে দূরে রাখিবেন অথচ সাহেবকে ডাকিয়া দেশের নামে নালিশ করিবেন, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য টুকু আমরা দেখিতে পাই না!

বর্ত্তমান সংখ্যক ভারতীতে "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আধুনিক বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার প্রস্তাবটির প্রতি পাঠকগণ মনোযোগ করিবেন।

ইতিহাসের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড় কঠিন। কথা সজীব পদার্থের মত বাড়িয়া চলে; মুখে মুখে কালে কালে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। সৃজনশক্তি মানুষের মনের স্বাভাবিক শক্তি,—যে কোন ঘটনা, যে কোন কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না, কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয়। এই জন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি।

কেহ কেহ এইরূপ প্রাত্যহিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইতি-

হাসের সত্যতা সম্বন্ধে আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু একটি কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতি বহুতর লোকের মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে—এবং সেই ঘটনার বিবরণে সাময়িক লোকের মনের ছাপ পড়িয়া যায়। তাহা হইতে ঘটনার বিশুদ্ধ সত্যতা আমরা না পাইতেও পারি কিন্তু তৎসাময়িক অনেক লোকের মনে তাহা কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা পাওয়া যাইতে পারে।

অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

এই বিচিত্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ-উপকরণ-মূলক ইতিহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অপ্রমাণ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দুই সাক্ষীর মধ্যে কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব তাহা অনেক সময়ে কেবলমাত্র বিচারকের স্বভাব ও পূর্ব্ব সংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরাজ সাক্ষী মিথ্যা বলে না, ইংরাজ জজ্ ইহা কতকটা স্বভাবতঃ এবং কতকটা টানিয়াও বিশ্বাস করেন ;—এই প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস বশতঃ তাঁহারা অন্যদেশীয়দের প্রতি অনেক সময়ে অবিচার করিয়া থাকেন তাহা ইংরাজ ব্যতীত আর সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

ইতিহাসে এইপ্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাস পাঠের পাড়ন কেন সহ্য করিব? আমরা যে ইতিহাস সংকলন করিব, তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি

না,—কিন্তু ইতিহাসের যে অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে, সে অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির স্বজন-কর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।

তাহা ছাড়া, ইতিহাস একতব্‌কা না হইয়া দুই তব্‌কা হইলে সত্য নির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক একভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্য ভাবে সাক্ষী সাজাইবেন,—তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।

যাহা হৌক্ বিদেশী-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে বিনা বিচারে গ্রহণ ও মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফার্ষ্ট্ প্রাইজ্ পাওয়া আমাদের গৌরবের বিষয় হইতেছে না। কোনও ইতিহাসই কোন কালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও ভূরি ভূ'র চিরপ্রচলিত দৃঢ়-নিবদ্ধ বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশীয় ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাছিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করি।

লেখক মহাশয় আমাদের দেশীয় ইতিহাস সমালোচন ও সংকলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমাদের দেশে সভাস্থাপনের প্রতি আমাদের বড় একটা বিশ্বাস নাই। লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের দেশের মাটিতে শিব গড়িতে গিয়া কিরূপ লজ্জা পাইতে হয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভা নামক বড় শিব গড়িতে গিয়া আরও কি বড় প্রহসনের সম্ভাবনা নাই!

যে দেশে কোন একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলি লোকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে, সেই দেশে উৎসাহী লোকেরা একত্র হইয়া

বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যে দেশে উৎসাহী লোক স্বল্প সে দেশে সভা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ সে সভায় অধিকাংশ বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লোকের উদ্যম খর্ব্ব করিয়া দেয় মাত্র।

আমরা লেখক মহাশয় এবং তাঁহার দুই চারিজন সহযোগীর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া আছি। তাঁহারা নিজেদের উৎসাহের উদ্যমে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকাংশের মনে এ সকল বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ নাই। অতএব তাঁহারা প্রথমে নিজের রচনা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেশে ইতিহাসানুরাগ বিস্তার করিয়া দিলে যথাসময়ে সভাস্থাপনের সময় হইবে।

সমবেত চেষ্টার জন্য উৎসাহী অনুরাগী লোকমাত্রেরই মন কাঁদে। মানুষ কাজ করিবার যন্ত্র নহে—অন্য পাঁচজন মানুষের সহিত মিশিয়া পাঁচজনের সহানুভূতি, সমাদর, ও উৎসাহ দ্বারা বললাভ প্রাণলাভ করিতে হয় ;—জনহীন শূন্য সভায় একা দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্য করিয়া যাওয়া বড় কঠিন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে যাঁহারা কোনও মহৎ কার্য্যের ভার লইবেন, লোকসঙ্গ লোকসাহায্যের সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই।

বিনা আড়ম্বরে বিনা ঘোষণায় ঐতিহাসিক চিত্রাবলী নামক যে কয়েকটি মূল্যবান্ ইতিহাসগ্রন্থ বাঙ্গলায় বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই আমাদের বিপুল আশার কারণ। যাঁহারা "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সভার দ্বারা কেমন কাজ হয় না প্রতিভার দ্বারা যেমন হয়।